# জ্যোৎস্নার খেলা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

—ঃ পরিবেশক ঃ—
মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

# জ্যোৎস্নার খেলা

বেশ ছিলাম আমরা।

কোনোরকম গোলমাল ছিল না আমাদের পাড়ায়।

হঠাৎ একদিন লামডিং না শিলিগুড়ি থেকে একজন এসে সব অন্যরকম করে দিল।

দিনটা মনে আছে।

শ্রাবণ মাসের এক শুক্রবারের ঝলমলে বিকেল। ক'দিন একটানা বাদলার পর সারা দুপুর ঠাঠাপোড়া রোদ গেছে।

তারপর, এমন দিনে যা হয়, একটা জলো ভেপসা গরম, বিকেল পড়তে ঝুরঝুরে হাওয়া ছাড়ল যদিও। তা হলেও ভাল লাগছিল।

এই আমাদের শহরতলী। গাছপালার অভাব নেই। জলে ধুয়ে সবুজে সবুজে চারদিকটা দারুণ চিক্‌চিক্‌ করছিল। তায় আবার ঝিঙে ফুলের রঙের মুঠো মুঠো রোদ্দুর। ছবির মতন দেখাচ্ছিল সব-কিছু।

ক'দিন ধরে আটক থাকার পর, আমরা যেমন খেলায় মেতে-ছিলাম, তেমনি শালিক বুলবুলিদের কিচিরমিচির ও ওড়াউড়ির শেষ ছিল না।

ঝাঁক বেঁধে সাদা সাদা প্রজাপতি ও গঙ্গাফড়িং নিজেদের বাসা ছেড়ে মাঠেঘাটে বেরিয়ে পড়েছিল।

আর ভুরভুরে কদম ফুলের গন্ধ। ওয়াটার লিলির গন্ধ। রংদুলালীর গন্ধ। সে সঙ্গে কামিনী ফুলের।

আর চিরকাল বর্ষার বিকেলে এক-একটা ডাঁটে গাদা গাদা হয়ে ফুটে থেকে যারা অফুরন্ত গন্ধ ছড়ায়। নাম রজনীগন্ধা বটে। কিন্তু রোদ হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে সুড়সুড়ি উঠে বাতাস

মাতাল করবার যা ঝোঁক চাপে না ওদের? যেন রোদ থাকতেই গন্ধ বিলোবার জন্য আকুল।

যে জন্য সময় সময় আমার মনে হত ওই ফুলটার বিকেলীগন্ধা নাম দিলেই-বা মন্দ কি।

এসব কাব্য থাক।

রজনী মিত্তিরের বাগানে কামিনী ফুটেছিল কি অঘোর দত্তর বাগানে রজনীগন্ধা—না কি শ্যামলদের পুকুরপাড়ের তিন তিনটে কদম গাছই ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গিয়েছিল, সেসব হিসেব করার খোঁজখবর নেবার আমাদের একেবারে সময় ছিল না।

এমন যে প্রিয় ফুটবল খেলা—তাও আবার সেদিন কোন্ এক প্রতাপ মেমোরিয়াল শীল্ডের দুর্দান্ত ম্যাচ খেলা চলছিল, তাতেও কিনা আমাদের ঝুড়ি ঝুড়ি অমনোযোগ এসে গিয়েছিল। যে জন্য দু'দুটো গোল খেয়েছিলাম আমরা ইয়াং-ইলেভেন্ ক্লাব।

তাই বলছিলাম, সব অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

একটানা চার বছরের চ্যাম্পিয়ান-শীপ দত্তপুকুরের গ্রীন ক্লাবের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল এ পাড়ার ইয়াং-ইলেভন্‌কে। এর চেয়ে পরিতাপের আর কিছু হতে পারত কি!

কিন্তু, কেমন ট্র্যাজেডি দেখুন, সেই দুঃখও আমরা গায়ে মাখিনি। কারণ?

কারণটাই এখানে বলছি।

মাঠে নামবার মুখে আমরা কচি পাতার রঙের ডজ গাড়িটা দেখছিলাম।

শ্যামলদের বাড়ী বাঁয়ে রেখে ওদের পুকুরপাড়ের মস্ত বড় বাঁকটা ঘুরে, অশ্বিনী চাটুয্যের বাড়ি ডাইনে ফেলে, তারপর অঘোর দত্তর বাড়ির প্রকাণ্ড গেট পার হয়ে সটান গাড়িটা যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল—দেখে আমরা থ!

পিন্টুর জেঠার বাড়ি।

মায়া-কুঞ্জ যার নাম। অতবড় একটা বাড়িতে একলা পিণ্টুর বুড়ো জেঠা ও বুড়ি জেঠি থাকে, এই শুধু জানতাম। তাঁদের কোনো ছেলেপুলে ছিল না।

তবে হ্যাঁ, পিণ্টুর অ্যাডভোকেট জেঠা শশী ঘোষের আত্মীয়-স্বজন কলকাতা ও শহরতলীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, পিণ্টুর মুখে শুনতাম। সবাই নাকি বড়লোক। গাড়ি বাড়ি আছে।

কিন্তু কাউকে কোনোদিন মায়া-কুঞ্জে উঁকি দিতে দেখিনি।

আজ তবে কে এল।

আমাদের কৌতূহলের পারদ ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছিল। শ্বাস বন্ধ করে আমরা ওদিকে তাকিয়ে ছিলাম।

গাড়িটা যখন আমাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে যায় তখন আমাদের কী মনে হয়েছিল।

জানালা দিয়ে একটা টাট্‌কা গোলাপ মুখ বাড়িয়ে আছে। মিটিমিটি হাসছে।

কী দেখে হাসছিল।

আমাদের গায়ের লালে হলুদে ডোরাকাটা জার্সি দেখে। পায়ের বুট দেখে?

মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ও নতুন জুল্‌পি দেখে!

না কি ইয়াং-ইলেভ্‌ন-এর এক-একজনের আটপৌরে নাক চোখ কপাল ভুরু আর গায়ের মেটে মেটে রং দেখে!

বুঝতে পারলাম না।

শ্যামলদের পুকুরপাড়ের বাঁক ঘোরা পর্যন্ত গাড়ির জানালায় গলা বাড়িয়ে রেখেছিল ওই গোলাপ ফুল।

আমাদের কারো মুখে শব্দ ছিল না।

তবু যদি পিণ্টুটা তখন সেখানে উপস্থিত থাকত।

তখন বলে নয়—পিণ্টু আর কোনদিনই আমাদের মধ্যে আসবে

না। বেচারা দু'বছর আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। পেটে টিউমার হয়েছিল।

হ্যাঁ, পিণ্টু থাকলে জেনে নেওয়া যেত, কে ওটি।

না, গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সাদা দাড়িঅলা বুড়ো সোফার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আশ্চর্য, বল নিয়ে আমরা মাঠে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু সোজা রাস্তায় না গিয়ে শ্যামলদের পুকুরপাড়ের রাস্তাটা ধরলাম।

তখন চারটে দশ।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় বল-এ কিক্ পড়বে। এটা জানা সত্ত্বেও আমরা সর্ট-কাট্ রাস্তায় না গিয়ে বাঁকা পথে কেন মাঠের দিকে এগোচ্ছিলাম আজ ভাবি। ওটাই আমাদের ভুল হয়েছিল।

আবার ভুলই বা বলি কেমন করে। এমন চমৎকার একটা গাড়ি চড়ে পাড়ায় এক নতুন 'ইভ' ঢুকেছে—অমন টকটকে গোলাপের মতন রঙ, বেশ একটু দূর থেকেই, গাড়ির জানালায় মুখটা দেখেই বুঝেছিলাম, মারাত্মক এক জোড়া ভুরু ও চোখের মালিক ওই মানুষটি।

আমাদের হৃৎপিণ্ডে বেশ একটু জোর ধাক্কা লেগেছিল। সেটা সামলান আমাদের পক্ষে কষ্ট ছিল। সতের থেকে উনিশের মধ্যে যাদের বয়েস। বিশেষ করে আমাদের দেখে মিটিমিটি হাসছিল না!

শ্যামলদের পুকুর পেছনে রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে আমরা এগোচ্ছিলাম। আমাদের তখন কৌতূহল ছিল গাড়িটা কোথায় দাঁড়ায় আগে দেখা যাক।

রজনী মিত্তিরের বাগানবাড়ি পার হয়ে গেল গাড়ি। অঘোর দত্তর দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল না। ব্যাপার কি! তবে কি গাড়িটা এ পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে—গন্তব্য আর এক পাড়ায়?

একটু সময়ের জন্য বুকটা দমে গিয়েছিল, হতাশ হয়ে পড়েছিলাম আমরা, অস্বীকার করব না।

ঠিক এক মিনিট পর মায়া-কুঞ্জের অপরাজিতা লতায় ঢাকা প্রকাণ্ড গেট-এর সামনে গাড়ি দাঁড়াল। অগুনতি অপরাজিতা ফুটে গেট্-এর মাথাটা নীল হয়ে আছে। তার ওপর বাড়িটা এত বেশী চুপচাপ। কেবল ভিতর থেকে দু' একটা পায়রার বকবকম শোনা গেল।

গাড়ি হর্ণ দিল।

কোনোরকম সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ভিতর থেকে কেউ বেরিয়ে এল না।

ততক্ষণে আমরা মায়া-কুঞ্জর প্রায় ফটকের সামনে পৌঁছে গেছি।

বুড়ো ড্রাইভার আরও দুবার হর্ণ বাজাল। কিছু ফল হল না।

তখন দেখলাম নিজেই গাড়ির দরজা খুলে সওয়ারটি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের চোখ ধেঁধে গেল। মুখের রঙ সোনালী। কিন্তু শরীরটা!

যেন একটা সদ্যফোটা সূর্যমুখীর ঝলক লাগল চোখে। টকটকে সোনালী হলুদ ম্যাক্সিতে শরীরটা মোড়া। ড্রাইভার ওদিক দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়ির পিছনের ঢাকনা তুলে দুটো ঢাউস সুটকেশ বের করে ঘাসের ওপর রাখল।

কিন্তু তারপর?

বাড়ির ভিতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে না। গেট্ বন্ধ। ইতিমধ্যে বুড়ো ড্রাইভার গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে। যেন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসে সওয়ারটিকে এখানে পৌঁছে দিয়েই তার কর্তব্য শেষ হল। তারপর কি হবে সে জানে না। এবং দেখতে না দেখতে সত্যি কচিপাতার রঙের গাড়িটা আমাদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

মা-মাসিদের মুখে শোনা পুরাণের গল্প-গাথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

রথে চড়িয়ে সারথি রাজকন্যাকে অরণ্যে রেখে গেল নাকি কোনো যমপুরীর সামনে।

ম্যাক্সি-পরা মানুষটি, আমরা অবাক হলাম, আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার মিটিমিটি হাসছে। হাসছে আর চোখ ঘুরিয়ে মায়া-কুঞ্জের বিশাল বন্ধ ফটকটা দেখছে, পরক্ষণে দৃষ্টি নেমে আসছে ওর পায়ের কাছে ঘাসের ওপর দাঁড় করান চামড়ার সুটকেশ ছুটোর ওপর।

পায়রার বকবকম শোনা যাচ্ছিল। ফটকের মাথায় অগুন্তি নীল অপরাজিতা হাওয়ায় নাচানাচি করছিল। মায়া-কুঞ্জ নিঝুম যক্ষপুরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অবস্থায় আমরা কী করতে পারি ভাবছিলাম। ইয়াং-ইলেভ্‌ন-এর তরতাজা এতগুলি জোয়ান। কিছু একটা তোমাদের করা উচিত। অপরাজিতা নাচানো ফুরফুরে হাওয়াটা যেন আমাদের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল। হেল্‌প। হেল্‌প।

তাই তো, বন্যার মুখে মানুষ মানুষকে সাহায্য করে, ঝড়ের মুখে পড়লে সাহায্য করে, জঙ্গলে পথ হারিয়ে গেলে সাহায্য করে —বা রেল স্টেশনের টিকিট ঘরের সামনের ভিড় দেখে একজন টিকিট কাটতে পারছে না দেখলেও আর একজন সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। জগতের তাই নিয়ম। এক্ষুণি ছুটে যান। হুইসল্‌ পড়ছে। ট্রেন ছেড়ে দেবে। মেয়ে হলে তো কথাই নেই। পড়ি-মরি করে আর একজন তক্ষুণি ছুটবে টিকিট কেটে আনতে।

এখানেও তো সেই অসহায় অবস্থা।

মিটিমিটি হাসলে কি হবে। হাসির আড়ালে কালো চিকচিকে চোখ ছুটোর মধ্যে ছুধের সরের মতন একটা ব্যাকুলতা ও বেশ খানিকটা উদ্বেগ ভেসে উঠতে দেখলাম।

তোমরা এ পাড়ার? সরাসরি প্রশ্ন।

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এত চট করে অচিন দেশের একটি কন্যা আমাদের সঙ্গে কথা বলবে, এ যেন স্বপ্নের অতীত।

হুঁ, এ-পাড়ার। আমাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল। ইয়াং-ইলেভ্ন-ক্লাবের মেম্বার আমরা।

অখিল না, রণেন না, স্বপন না, শ্যামল না। মণ্টু, শোভন বা দীপেনও নয়—বাবলা, বাবলা কথা বলল।

আমরা জানতাম, যদি কথা বলার দরকার পড়ে, বাবলা সকলের আগে মুখ খুলবে। পরের সাহায্য করতে সারাক্ষণ যে হাত বাড়িয়ে রয়েছে, পা বাড়িয়ে রয়েছে। আর তার আঠারো বছরের জীবনে এক রাতের জন্যও যে স্বপ্ন দেখতে ভুলছে না। বলা যায় স্বপ্নের জাঁদরেল কারবারী আমাদের এই বাবলাচন্দ্র। তার কাছ থেকে আমরা স্বপ্ন কিনি। কখনও ধারে কখনও নগদে।

তার মধ্যে আবার বাসী স্বপ্ন টাটকা স্বপ্নও আছে। বাসী স্বপ্ন কখনও কাউকে সে ধারে বিক্রী করবে না। মিষ্টির দোকানে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে রাজভোগ রসগোল্লা বা রেস্তোরাঁয় ঢুকে মাংসের চপ চিংড়ি কাটলেট খাওয়াতে হবে।

বাসী স্বপ্ন অবশ্য একটা সিগারেট একটিপ নস্যি এক কাপ চায়ের বিনিময়ে অনেক সময় তার কাছ থেকে আমরা পেয়ে গেছি।

কাজেই মায়া-কুঞ্জের সামনে একটা চকচকে ডজ্ গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা অচেনা সুন্দর মুখের ওই মেয়ের সঙ্গে যখন বাবলা অত চটপট কথা বলতে পারল, দেখে আমাদের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল, এখানেও আবার স্বপ্ন-টপ্নের ব্যাপার নেই তো।

বিশ্বাস কি, যদি ও বলে বসে কাল রাত্রে এমন গোলাপী চেহারার সূর্যমুখী রঙের ম্যাক্সিপরা একটি মেয়েকে ভাই আমি স্বপ্নে দেখে-ছিলাম। গাড়ি চড়ে শ্যামলদের পুকুরপাড় হয়ে রজনী মিস্তিরের

বাগানবাড়ির সামনে দিয়ে অঘোর দত্তর বাড়ি পিছনে রেখে পিণ্টুর জেঠার বাড়ির ঠিক সামনে এসে নামবে।

হয়তো আমাদের গা ছুঁয়ে দিব্যি কাটবে। এবং বাকি রাতটা ওই কন্যাকে নিয়ে আরও কি কি স্বপ্ন দেখেছিল—তারপর আর এক ফোঁটাও আমাদের কাছে সে বলতে চাইবে না—মানে সেসব অনেক বেশি টাটকা স্বপ্ন। ধারে বেচতে ভীষণ আপত্তি করবে বাবলা। তখন যে আমাদের মনের অবস্থা কী দাঁড়াবে না!

দাঁড়িয়ে এসব আমরা ভাবছি, হঠাৎ দেখি বাবলা গেট্-এর কাছে ছুটে গিয়ে কলাপসিব্‌ল দরজা ধরে ঠেলাঠেলি করছে। আর একটু জোরে ঠেলা দিতেই, বোঝা গেল ভিতর থেকে তালা-টালা লাগান ছিল না, আমরা যা সন্দেহ করছিলাম, লোহার চাকার ওপর বসান পাল্লা দুটো হুড়হুড় করে দুদিকে সরে গেল।

সরে যেতেই দেখলাম ওয়াটার লিলির সঙ্গে আকন্দ ঝোপ, আকন্দ ঝোপের পাশাপাশি যূঁইচামেলী, যূঁইচামেলীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বনতুলসী, বনতুলসীর গা ঘেঁষে এত এত ফণিমনসার ডগা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বোঝা গেল পিণ্টুর জেঠার বাগানের আজ এই দশা হয়েছে।

আমাদের মনে পড়ল, পিণ্টু প্রায় রোজ আমাদের জন্য জেঠার বাগান থেকে এত গোলাপ ফুল চুরি করে নিয়ে আসত।

আমরা তাকে শাসাতাম, গোলাপ ফুল না আনলে তোকে ইয়াং-ইলেভ্‌ন্ ক্লাব থেকে বার করে দেব।

বেচারা রোজ আমাদের জন্য জেঠার বাগানের গোলাপ চুরি করে আনত। ইয়াং-ইলেভেন্‌কে সে বাগানের মতন ভালবাসত কিনা! আহা অকালে মরে গেল।

পিণ্টুর মুখেই শুনেছিলাম, তার জেঠার বাগানে গোলাপ আর যূঁইচামেলী ছাড়া অন্য কোনো ফুলগাছ নেই।

কাজেই ঘড়ঘড় শব্দ করে ফটকের দরজাটা খুলে যেতেই বাগানের

অবস্থা দেখে এক সময় আমাদের পিণ্টুর ও সেইসব খানদানী গোলাপের চেহারা মনে পড়ে বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আর আমরা দেখলাম, ইতিমধ্যে বাবলা দু হাতে স্যুটকেশ দুটো তুলে নিয়েছে। তার বাইসেপ ফুলে উঠেছে।

আমরা সব চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম. রীতিমত বোকা বনে গিয়ে হাঁ করে রইলাম।

আমাদের দিকে আর একবারও তাকাল না ম্যাক্সি-পরা রাজকন্যা; বাবলার পিছু পিছু ফটকের ভিতর ঢুকে পড়ল।

সেদিন ম্যাচ খেলায় আমরা হেরে গেলাম। একেবারে দু দুটো গোল। সেই গো-হারা হেরে যাওয়া যাকে বলে।

সবটা রাগ গিয়ে পড়ল বাবলার ওপর। একাধারে সে ইয়াং-ইলেভ্ন্ এর ক্যাপ্টেন এবং হাফ ব্যাক।

নিশ্চয়ই ওই বেটা মাঠে নেমে সূর্যমুখী রঙের ম্যাক্সির স্বপ্ন শুধু দেখছিল। তা না হলে দু দুবার তার নাকের সামনে দিয়ে বল নিয়ে ছুটে গিয়ে দত্তপুকুরের গ্রীন-ক্লাবের এমন লকপকে মেয়েলী চেহারার সেই লেফ্ট-ইন্ ছোঁড়া গোল দিতে পারে।

খেলার পর, আমাদের আড্ডাস্থল, বনমালীর চায়ের দোকানে বসে খুব করে বাবলাকে গালিগালাজ করছিলাম।

এই এক ছেলে, বাবলাকে যত দেখি আমরা অবাক হই: এমন কয়েকটা বিশেষ গুণ তার মধ্যে রয়েছে, যেসব গুণের ছিটেফোঁটাও আমাদের কারো মধ্যে নেই।

তুমি যত খুশি গালমন্দ কর, বাবলা কোনোদিন রাগ করবে না। না-বেঁটে, না-লম্বা কালো কালো মাঝারি সাইজের গড়ন। দাঁতগুলি সারাক্ষণ ঝকঝক করে। তার চেহারার যেটা সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য—দুটো চোখ এক মাপের নয়। ডান চোখের চেয়ে বাঁ-টা একটু বড়।

আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, তোর দু রকম চোখ, তাই দুভাবে তোর রাত কাটে। একটা কেবল আজেবাজে স্বপ্ন দেখে, আর একটা চোখ ঘুমিয়ে রাত কাবার করে।

তোর কোন্ চোখটা স্বপ্ন দেখে বাবলা? মন্টু একদিন প্রশ্ন করেছিল।

দীপেন তৎক্ষণাৎ উত্তর করেছিল, বাবলার বাঁ চোখটা স্বপ্ন দেখে।

আমি বলেছিলাম, ডান।

বাবলা হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের কারো উত্তরই ঠিক হল না। তারপর স্বপনের দেওয়া একটা ক্যাপ্‌স্টান পেয়ে খুশি হয়ে বাবলা বলল, পাল্টাপাল্টি করে আমার দুটো চোখই স্বপ্ন দেখে। যখন মেয়েদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি তখন আমার ছোট চোখটা, অর্থাৎ ডান চোখের কাজ চলে। বাঁ-চোখ মড়ার মত ঘুমোয়। যখন তোদের নিয়ে অর্থাৎ ছেলেদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি, তখন আমার বড় অর্থাৎ বাঁ-চোখটা অ্যাক্‌টিভ হয়ে ওঠে, ডানটা গাধার মতন ঘুমোয়।

জানি না, আমাদের খুশি করতে বাবলা এমন একটা উত্তর করেছিল কিনা। আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে বড় চোখটা সে ব্যবহার করে।

যাক, যে কথা হচ্ছিল। শ্রাবণ মাসের সেই শুক্রবার বিকেলের ঝিঙেফুলের রঙের রোদ মাথায় মুখে মেখে পিন্টুর জেঠার বাড়ির প্রকাণ্ড ফটকটা পার হয়ে যে ভিতরে ঢুকে পড়ল, আর ঠিক একটা বেয়ারা দারোয়ানের মতন যার সুটকেশ বয়ে নিয়ে বাবলা আগে আগে গেল—দেখে আমাদের রীতিমত গা-জ্বালা করছিল।

তা-ও যদি সেদিনের ম্যাচ খেলায় জিততে পারতাম।

হেরে গিয়ে সবটা দোষ বাবলার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বনমালীর চায়ের দোকানে বসে বাবলাকে আমরা কী না বলেছি! রাগ করেনি, একবারের জন্যও মেজাজ খারাপ করেনি সে। আর এদিকে একতরফা বকতে বকতে আমরা একসময় সত্যি টায়ার্ড হয়ে পড়লাম। যেন মুখে ব্যথা ধরে গেল।

এখানেই বাবলার বাহাদুরী। আমাদের গালিগালাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খোলেনি। আমরা চুপ করতে সাদা দাঁত ছড়িয়ে সে হাসল।

তোরা সবাই মিলে আমায় দোষ দিচ্ছিস—তোরাও তো সর্টকাট রাস্তায় খেলার মাঠে না গিয়ে ঘুরপথে রওনা হলি।

তা নাহয় ঘুবপথে গিয়েছিলাম, মণ্টু তৎক্ষণাৎ উত্তর করল, নতুন চেহারার মেয়ে দেখে আমাদের জানতে ইচ্ছে করছিল কোন বাড়িতে ঢোকে—

তা বলে তুই কিনা, শ্যামল বলল, রীতিমত ওবাড়ির দারোয়ান সেজে ফটক খুলে দিলি, সুটকেশ বয়ে নিয়ে গেলি—কেন, ওসব করার দরকার ছিল কি?

এতে আমাদের প্রেস্টিজ নষ্ট হয়েছে, দীপেন বলল, ও ঠিক ধরে নিয়েছে আমরা ওকে তোয়াজ করতে খুশি করতে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছিলাম।

তাই তো, বাবলার চোখে চোখ রেখে আমি বলেছিলাম, আর একদিন দেখা হলে ঠিক তোকে বলবে ওর নোংরা শাড়ি সায়া লনড্রিতে দিয়ে আসতে।

দরকার হলে আর একদিন তোকে বলবে—কথাটা বলতে গিয়ে দীপেন ফিকে হেসেছিল, আমার হাইহিল জুতোর এক পাটির গোড়ালী খুলে গেছে, মুচি ডেকে ঠিক করে দাও, বা জুতোটা হাতে করে নিয়ে যাও, যদি কোথাও মুচি চোখে পড়ে তোমার—

মণ্টু বলছিল, এতে করে তোর বন্ধু হিসেবে আমরাও চীপ হয়ে গেছি, ও ভাবল কি, না ডাকতেই লে-লে করে বশংবদ কুকুরের মতন ওরা ছুটে আসে। ভবিষ্যতেও আসবে।

তাই তো, আমি বললাম, হেল্প করার কি আর মানুষ ছিল না।

পরের উপকার করতে তোর মতন আমরাও সব সময় রাজী। কিন্তু কার উপকার করব, কাকে সাহায্য করব, সেটা ভেবে দেখতে হবে না! একটা অন্ধ মানুষ রাস্তা পার হতে পারছে না। হাতে ধরে তাকে রাস্তা পার করে দেব, বুড়ো মানুষ বাস-এ বা ট্রেনে উঠতে পারছে না, তাকে যেমন করে হোক গাড়িতে তুলে দেব—ভিকিরি গাছতলায় শুয়ে না খেয়ে মরছে—যে যার বাড়ি থেকে ভাত রুটি দিয়ে হোক বা নিজেরা চাঁদা তুলে হোক, সাহায্য করব। এটা আমাদের ডিউটি। এখানে তো তা নয়! জানি না, চিনি না—এর আগে কোনদিন চোখে দেখলাম না—যেহেতু গায়ের রঙটা টকটক করছে, যেহেতু একটা দামী গাড়ি থেকে নামল, যেহেতু চোখ-ঝলসান ম্যাক্সি পরনে, যেহেতু পিণ্টুর বড়লোক জেঠার বাড়িতে ঢুকছে—বাস, অমনি রাজকন্যার সার্ভিসে লেগে গেলাম।

আমাদের বলা শেষ হবার পর বাবলা তার সাদা দাঁতে আর একবার হাসল। বলল, সার্ভিস আর তেমন কি, ফটকটা খুলে দিলাম, আর সুটকেশ দুটো বাড়ির ভেতর পৌঁছে দিলাম।

হুঁ, তা তো দিলিই, কত বকশিশ পেলি শুনি? মণ্টু নতুন করে বলে উঠল। মিলল কিছু বকশিশ!

বকশিশ আবার কি, একটা হাই তুলে বাবলা বলল, এইটুকুন উপকার কি ও আমাদের কাছ থেকে আশা করতে পারে না! নতুন এসেছে।

না, পারে না। গম্ভীরভাবে শোভন বলল, ওসব বাবু মেয়েদের আমরা অনেকদিন আগেই চিনে গেছি। উপকারের কথা ওরা মনে রাখে না। তুই কি আজ আমাদের নতুন করে ওদের চেনাচ্ছিস।

না না, ঠাণ্ডা গলায় বাবলা আমাদের আশ্বাস দিল, আর পাঁচটি

মেয়ের মতন ও হবে না, আমি হলপ করে বলতে পারি। নাম রুবি। পিণ্টুর জেঠার ছোট ভায়ের মেয়ে। পিণ্টুর জেঠি বলল, খুব ভাল মেয়ে। শিলিগুড়ি ছিল বাবার কাছে। বাবা রেলের বড় অফিসার। বদলী হয়ে এখন লামডিং আছে। ও চলে এসেছে আমার কাছে। আমার কাছে থেকে লেখাপড়া করবে। অমাদের এই শহরতলীর রাস্তাঘাট চেনে না! কলকাতায় এসে রামদুলাল স্ট্রীটে মামার বাসায় উঠেছিল। মামার ড্রাইভার গাড়ি করে রুবিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল।

বাঃ! রাজকন্যার এখানে আবির্ভাবের ইতিহাসটা খুব মন দিয়ে শোনা গেল। শুনে আমরা চুপ করে রইলাম। তারপর বাবলা আরও যা বলল, বুঝলাম পিণ্টুর জেঠি, যেহেতু রুবির এইটুকুন উপকার করেছে বাবলা—খুশি হয়ে বাবলাকে চায়ের নেমন্তন্ন করে বসেছে। তখনই জেঠি খেতে বলেছিল। কিন্তু জার্সি গায়ে ম্যাচ খেলতে মাঠে চলেছে সে, রেফারীর হুইসেল শোনা যাচ্ছে, কাঁটায় কাঁটায় এবারও চারটায় কিক্-অফ্—সুতরাং আজ হয় না, আর একদিন, আর একদিন বাবলা চা খেতে আসবে।

এই পর্যন্ত শুনে এক সঙ্গে মণ্টু, দীপেন, শোভন, শ্যামল হৈ হৈ করে উঠল। তবেই ছাখ্, তুই কত বড় সেল্‌ফিস। এক সঙ্গে আমরা উঠি বসি, খেলাধুলা করি। দু মিনিট ও-বাড়ির সঙ্গে মেশামেশি করে একলা কেমন চমৎকার একটা নেমন্তন্ন বাগিয়ে নিলি।

তাই তো। আমি খুব একটা গম্ভীর না থেকে সামান্য হাসলাম। আমাদের ফেলে মায়া-কুঞ্জে চায়ের নেমন্তন্ন খেতে কি করে তোর মন উঠবে একবার ভেবে ছাখ বাবলা।

হাড়কিপটে কঞ্জুস পিণ্টুর জেঠা জেঠি। এই তল্লাটের সবাই চেনে ওদের। দীপেন নাক সিঁটকাল। একলা কি বলে তোকে চায়ের নেমন্তন্ন করল, তার মানে তোকে হাতের মুঠোয় রাখছে।

তারপর থেকে তোকে দিয়ে ও-বাড়ির বাজার সওদা করাবে, ময়লা কাপড়চোপড় লনড্রিতে পাঠাবে। শুধু কি এই। ইলেকট্রিকের বিল মেটাতে, ডিপো থেকে দুধ আনতে, রেশন ধরতে—অনেক কিছুর জন্য মায়া-কুঞ্জে ঘনঘন তোর ডাক পড়বে। দেখছিস তো, চাকর দারোয়ান মালী বলতে কেউ নেই ওবাড়িতে।

আঃ, হাতের মোয়া কিনা বাবলা! এবার বাবলা খিলখিল করে হাসছিল। তোরাও যেমন, পিণ্টুর জেঠি আমাকে খেতে বলল, আর আমিও তোদের ফেলে নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছি কিনা ওখানে। আর কী হাতিঘোড়া খেতে দেবে, তোরা যেমন জানিস, আমিও জানি। *আসলে তা নয়। ওর জন্যে—এই যে আজ নতুন এখানে এলো, ও:ক দেখেই আমার……*

বাবলার কথা শেষ হয়নি। মণ্টু ভেংচি কাটল। ওকে দেখে তোর মাথাটা ঘুরে গেল, বুকটা হু হু করে উঠল। তাই না!

তাই তো বলছিলাম, শোভন আর একবার নাকে হাসল, তারপর একদিন রুবির ছেঁড়া চটিটা বগলদাবা করে তোমাকে মুচির কাছে ছুটতে হবে।

না না না! বাবলা মাথা দোলাল, তোরা সবাইকে একরকম ভাবিস না, সকলের মন যদি একরকম হত তো পৃথিবীটা ভয়ানক একঘেয়ে হয়ে যেত। আমি বলছি, এই মেয়ে সেই মেয়ে নয়। রুবি অন্যরকম।

আহ্ রুবি অন্যরকম। শ্যামল হাসল কি নাকের শব্দ করল বোঝা গেল না। চোখ দুটো বনমালীর খটখটে ইলেকট্রিক ফ্যানটার দিকে তুলে দিয়ে গভীর নিশ্বাস ফেলল। রুবি অন্য ফুল, রুবি অন্য জানি, না কি রুবি পদ্মরাগ মণি…

পদ্মরাগ মণি কি আমাদের কাঁটাপুকুরের শালুক, দুদিন সবুর কর, তখন বোঝা যাবে। মণ্টু বলল, নাটকের সবে শুরু, এখন কি!

বুঝলি! দীপেন চোখ ঘুরিয়ে বাবলাকে বোঝালে তোর পদ্মরাগ

ভাবতাম, কবে আমরা শোভনের ছোড়দার মতন বড় হব—একটা স্কুটার কিনব, আর পপিদির মতন গনগনে আগুনে চেহারার যোধপুরী পরা কাউকে পিছনে তুলে নিয়ে হাওয়ার আগে পালিয়ে যাব।

যতদূর চোখ যেত, হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। জোঁকের মতন ছোড়দার পিঠ আঁকড়ে ধরে থাকা সবুজ যোধপুরী পরা পপিকে মনে হত একটা ঘাস ফড়িং বুঝি কোনো মানুষের পিঠ কামড়ে ধরে আছে। তবে হাওয়ায় হর্স-টেল বেণীটা অবিকল ঘোড়ার লেজ হয়ে উড়ত বলে তত আর ওকে ফড়িং ফড়িং মনে হত না—একটা মেয়েলি চমক বিদ্যুৎ ঝলকের মতন আমাদের বুকের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে খেলা করে উঠত। যেজন্য—যেজন্য হাফ-প্যান্ট পরা স্কুলের বই খাতা বগলে আমরা ন' দশ বছরের ক'টি ছেলের মনে ঐ লালচে বেণী ঘাস ফড়িং-এর রঙের সবুজ পোশাকের একটা স্বপ্ন আঁকা হয়ে ছিল বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। এখন কোথায় সেই স্বপ্ন!

ভয় পেয়ে আমরা সামলে গেছি। মনে আছে শোভনের ছোড়দা আই. এ. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিল। কী ভয়ানক ভাল ছেলে ছিল। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধূলায়। তেমনি দেখতে শুনতে।

যাক, গল্প হচ্ছে রুবিকে নিয়ে। অপরাজিতা লতায় ঢাকা ফটকওয়ালা মস্ত একটা বাড়িতে এখন আছে। যে বাড়ীর মালিক হাড়কিপটে অ্যাডভোকেট শশী ঘোষ। ডেইজি থাকত ব্যুগেনভিলা লতায় ঢাকা আর একটা প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীতে। যে বাড়ীর মালিক রজনী মিত্তির। ঐ আর এক টাকার কুমীর। কলকাতার ডাকসাইটে ডাক্তার। তেমনি পয়সাওয়ালা মানুষ অঘোর দত্তর ভাগ্নী না যেন ভাইঝি হল এ পাড়ার বিখ্যাত সুন্দরী পপি। যার গল্প এতক্ষণ বলা হল। টুবলীদি থাকত শ্যামলদের বাড়ির পিছনে অশ্বিনী

চাটুয্যের রজনীগন্ধায় ছাওয়া ছবির মতন সুন্দর বাড়ি অলকা-কুঞ্জে। কেমন টকটকে রং মাখত গালে ও ঠোঁটে। রাস্তায় বেরোলে রাস্তাটা আলো হয়ে যেত। দীপেনের প্রফেসর মামার কি আর সাধে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

আমরা ভুল করেও এখন সেসব বড় বড় ফুল ও সুন্দর সুন্দর লতায় ঢাকা বাড়িগুলির দিকে তাকাই না।

বরং পাড়ার বস্তিটস্তি মার্কা খোলার বা টালির বাড়িগুলি আমাদের ভাল লাগে। আমাদের চোখ বেশি টানে।

না, সেসব বাড়িতে যারা থাকে তাদের কিন্তু 'পপি' 'ডেইজি' 'লাভলি' 'টুবলী' বা 'রুবি' নাম নয়।

কারো নাম শান্তা, কারো নাম জোনাকী। পুতুল বা মায়া নামও আছে। একটা নাম শুনেছি টুকু।

যেন টুক করে জানালা খুলে মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে লাজুক লাজুক চোখে তোমাকে দেখবে।

তা বলে কি ওরা সাজপোশাক করে রাস্তায় বেরোয় না?

খুব বেরোয়। সিনেমা দেখতে যায়। যাত্রা শুনতে যায়। পাড়ার এই ফাংশনে সেই ফাংশনে দল বেঁধে আসে।

তেমনি আবার বাড়ি ফিরে সুরু করে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে কি মা-মাসির মুখে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা শুনতে তাদের সমান আগ্রহ।

শ্ল্যাক্স বেলবটস্-এর বদলে ঢাকাই কি মাদ্রাজী তাঁতের দিকে ঝোঁকটা বেশি।

গালে ঠোঁটে চড়া রঙ মাখার চেয়ে আলতো করে চোখে কাজল বুলিয়ে একটি কাচপোকার টিপ পরে বেল ফুল বা একটি অপরাজিতা চুলে গুঁজে সেজে থাকতে ওদের পছন্দ বেশি।

ডেইজি পপিদের মতন তারা কোনদিন ফিল্মে নামার বা রেডিওতে গান করার কি এয়ার হোস্টেজ হয়ে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখে না। নিদেন একটা মেয়েস্কুলে মাস্টারী কি কোনো অফিসে

চাকরি পেলে তারা খুশি। যদি ইতিমধ্যে বর জুটে যায় আরো খুশি। সেটাই ওদের বেশি ভাল লাগে। এক সন্ধ্যায় টুনি বাতি জ্বেলে ঘরদোর সাজান হবে, মাইক বাজবে, গুচ্ছের বন্ধু নিয়ে বেলঘরিয়া কি শ্যামগ্রাম থেকে বর আসবে, আর সেজেগুজে চন্দনের ফোঁটা 'পরে ওরা গিয়ে ছাদনাতলায় বসবে—শান্তা-জোনাকী-পুতুল-মায়া এমন কি তেরো বছরের টুকুও এই স্বপ্ন দেখে।

আবার বাপ-মা কি কাকা-পিসিদের না জানিয়ে মনের মানুষটিকে নিয়ে টুক করে এক দুপুরে বিয়ের অফিসে গিয়ে চুপি চুপি লেখাপড়া করে কাজটি সেরে আসা—এমন বিয়েও যে ওদের মধ্যে কেউ কেউ করেছে না তা নয়। জানতে পেরে বাপ-মা কান্নাকাটি করে, কাকা-পিসি দাদারা রাগারাগি করে।

কিন্তু ন'মাস ছ'মাস যেতে দেখা যায় বাবা-মা কান্নাকাটি ভুলে গেছে। কাকা-পিসিদের রাগ জল হয়ে গেছে। বরের হাত ধরে একদিন রিক্সা থেকে মেয়ে নামে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে উলুধ্বনি, শোনা যায়, শাঁখে ফুঁ।

তাই তো, ওরা দু'টিতে যে সুখী হয়েছে এটাই বড় কথা। বাব-মা ও কাকা-পিসিরা বলাবলি করে। আর ঠিক সেই ফাঁকেই ননদের কানের কাছে মুখটা নিয়ে মা ফিসফিসিয়ে বলে, শান্তার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে ও অন্তঃসত্ত্বা ঠাকুরঝি—ছেলেপুলের মা হবে। এক গাল হেসে পিসি বলে, তা না হলে আর বিয়ে কি।

আর এদিকে? ছেলেবেলায় বুঝতাম না, এখন বুঝি পপি ডেইজিরা টকাস টকাস টেবলেট গেলে। বাচ্চা হলে শরীর নষ্ট হবে। হুঁ, তারা খেত বিয়ের পরে, এখন দেখছি বিয়ের আগেই টুবলীদের মতন লাভলি আর ওদের বন্ধুরাও হরদম চালাচ্ছে।

সেদিন ইয়াং-ইলেভন্-এর ক্লাব ঘরে বসে সারা দুপুর বাবলাকে এসব বোঝান হল।

কথায় বলে চোরা না শুনে ধর্মের বুলি।

আমরা বকে বকে হয়রান। কিন্তু বাবলার চোখ থেকে 'রুবি'-র রং কিছুতেই মোছে না।

কথাটা উঠেছিল ওবাড়ির চায়ের নেমন্তন্ন খাওয়া নিয়ে।

আমরা ভাবতেই পারিনি, এতবড় একটা ম্যাচ খেলায় হেরে গিয়ে কোথায় আমরা মুখ চুন করে সাতদিন ঘরে বসে থাকব—তা না। বাবলা পরদিনই ছুটে গেছে মায়া-কুঞ্জে। কি ব্যাপার! তার মাথায় রুবির কলেজে ভর্তি হওয়ার চিন্তা। বুঝুন ব্যাপার। পিন্টুর জেঠি নাকি আগের দিনই তাকে বলে দিয়েছিল, বাবলার ভাষায় 'রেকোয়েস্ট' করেছিল—আমাদের এই শহরতলির 'বিধুমুখী' কলেজে রুবির জন্য একটা সীট দেওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে।

ঐ যে, পরের উপকার। হঠাৎ কারো উপকার করার সুযোগ পেলে বাবলা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। পরদিনই ছুটোছুটি করে কোথায় কোন এম-এল-এ আছে, তাঁকে ধরে, প্রিন্সিপালকে ধরে ঠিক রুবির ভর্তির ব্যবস্থা করে মায়া-কুঞ্জে গিয়ে জেঠিকে খবরই দিয়ে এল। জেঠি হাতে স্বর্গ পেল। খুশি হয়ে আবার সেই চায়ের নেমন্তন্নর কথাটা তুলতে বাবলা নাকি মাথা বাঁকিয়েছিল, বলেছিল—আমি তো একলা নই, আমার বন্ধুরাও সঙ্গে আছে। রুবির ভর্তির ব্যাপারে তারাও যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে।

অ, তাই নাকি! শুনে জেঠি প্রথমটা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেও শেষকালে নাকি খুশি হয়ে ঘাড় কাত করে বলেছিল, বেশ তো, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সবাই এখানে আমার দোতলার বারান্দায় বসে চা খাবে, গল্পসল্প করবে। রুবির সঙ্গে তোমাদের সকলের পরিচয় হয়ে থাকা ভাল। নতুন এসেছে ও, জেঠি বলেছিল।

বাবলা যখন গল্পটা করছিল শোভন, দীপেন ও মণ্টুর মতন আমিও প্রায় আকাশ থেকে পড়লাম।

স্বপন পিছন থেকে নাকের একটা বিচ্ছিরি শব্দ করে হাসছিল।

শ্যামল অনেকক্ষণ থেকে চেহারাটাকে কাট কাট করে ক্লাবঘরের মেঝেয় পায়চারি করছিল।

শ্যামলই প্রথম কথাটা তোলে। আমাদের এই ব্যাপারে জড়ানো তোর আদৌ ঠিক হয়নি বাবলা। খুব খারাপ কাজ করেছিস।

তাই, আমিও তৎক্ষণাৎ বললাম, কিপটে ঘোষ-গিন্নীর হাতের চা খেতে আমরা ছটফট করছিলাম কিনা—যেন রাত্তিরে আমাদের কারো ঘুম হচ্ছিল না।

মন্টু বলল, একলা তুই খেতে যা, আমরা যাব না ওবাড়ি। কিছুতেই যাব না।

তাই তো, দীপেন মাথা ঝাঁকায়, এমন জলজ্যান্ত একটা মিছে কথা বলে আমাদের সবাইকে ওখানে চা খেতে ডেকে নিয়ে যাওয়া ঘোর অন্যায়। তোর একবার ভেবে দেখা উচিত বাবলা।

না ভাবলাম কি—ঢোক গিলে ফ্যালফাল করে আমাদের মুখের দিকে একটু সময় একটু তাকিয়ে বাবলা একবার দাঁত ছড়িয়ে হাসল। তোদের সকলের যদি আলাপ পরিচয়টা হয়ে যায়...

এতক্ষণ আমাদের ক্লাবের আর দুটি মেম্বার তারাপদ ও মিহির চুপ ছিল। এবার একসঙ্গে দুজন হৈ হৈ করে উঠল।

কার সঙ্গে আলাপ পরিচয়—শিলিগুড়ি না লামডিং থেকে চালান এসেছে ওই বাবু মেয়েটার সঙ্গে? কেন, দরকার কি আমাদের ওর সঙ্গে পরিচয়-টরিচয়ের।

তা না হলে আমাদের জ্বালাবে কেমন করে! স্বপন নাকে হাসল।

মন্টু বলল, দেখতে খরগোসের বাচ্চাটির মতন কত যেন নিরীহ। যেন একটা আরসোলা দেখে ভয় পাবে। আমার তো মনে হয়, একবার যখন পাড়ায় ঢুকেছে, আমাদের কারো না কারো বদনামটি করে তবে ছাড়বে।

হুঃ। কী যে বলিস না তোরা। বাবলার গলায় আক্ষেপের স্বর শোনা গেল। তবে আর প্রথমদিন আমাদের ফেলে এত মিষ্টি করে ও হাসত না।

তোর মাথায় কিসসু নেই বাবলা। তারাপদ রেগে গেল। ঐ মিষ্টি হাসির মধ্যে কতটা চিনি ছিল, আর কতখানি কুইনাইন, কি করে তুই বুঝবি, সবে এসেছে, এখনো তো বাজিয়ে দেখা হল না।

আমার তো মনে হয়েছিল, এবার শ্যামল বলল। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেখে আমাদের ফেলে সেদিন ও হাসছিল—তার অর্থ, আমাদের ও ঘেন্না করছিল, ওট ওর ঘেন্নার হাসি ঠাট্টার হাসি ছিল।

ঘেন্না কেন। বাবলা ভুরু কুঁচকায়। ঠাট্টাটাই বা কেন—এখনো আমাদের ও ভাল করে চেনে না, জানে না, আমরা কে কি করি, কোথায় থাকি।

তা আর জানতে হয় না। তারাপদ চোখ মটকালো। এক-নজর দেখেই বুঝে ফেলেছে, মেয়ের জাত তো, আমরা এ-পাড়ার ক'টি রকবাজ ছেলে। শীতকালে সারা দুপুর মাঠে ক্রিকেট ট্রিকেট পিটি আর গরমে ফুটবল খেলা। এছাড়া আর কিছু জানি না। খেলার সময় ছাড়া বাকি সময়টা রকে বসে ভাল ভাল চেহারার মেয়ে দেখে মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সিটি মারি, আর টিটকিরি দিই।

মোটেই না, মোটেই না। বাবলা তৎক্ষণাৎ মাথা ঝাঁকাল। আমাদের সম্পর্কে এমন বাজে ধারণা ওর নেই। বিশেষ করে পিন্টুর বন্ধু আমরা—পিন্টুর জেঠি যখন ওর কাছে মোটামুটি আমাদের পরিচয়টা দিল—আমি দেখছিলাম ওর চোখ দুটো কি ভীষণ নরম হয়ে উঠেছিল। তখনই টের পেলাম ওর মনটাও নরম—

হুঁ, ফুলের পাপড়ির মতন সফট্ তাই না? মন্টু ভেংচি কাটল।

তোর সবটাই তো কল্পনা। তারাপদ বলল, প্রথম দিন থেকেই

ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছিস। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পিণ্টুর জেঠির ভায়ের মেয়ে কেবল ছটফট করছে।

ভাইঝি কলেজে ভর্তি হতে পারবে—সুখবরটা যখন পিণ্টুর জেঠিকে গিয়ে তুই বললি, তখন ভাইঝিটি কোথায় দাঁড়িয়েছিল শুনি? দীপেন প্রশ্ন করল।

ভাত খাচ্ছিল, বাবলা বলল, খাবার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বার বার জেঠিকে আর আমাকে দেখছিল ও।

আহা, জেঠিকে আবার কেন—তোকেই গলা বাড়িয়ে দেখছিল বল না। শোভন টিটকিরি দিতে ছাড়ল না। কি দিয়ে ভাত খাচ্ছিল, মুরগির মাংস না মাটন।

পুঁই চচ্চড়ি আর খেসারী ডাল। কিপটের বাড়ির খাওয়া। শ্যামলের নাকের পাটা কুঁচকে গেল। মুরগি মাটন এনে ভাইঝিকে খাওয়াবে—তবেই হয়েছে—

আমার কি মনে হয়, আমি বললাম, পিণ্টুর জেঠি মেয়েটাকে এখানে এনে রেখেছে স্রেফ ঘরের কাজকর্ম করবার জন্য। ফাইফরমাজ খাটাবার জন্যে। কলেজে পড়ান-টড়ানটা আসলে কিছু নয়—একটা শো—বাইরের লোককে ভাঁওতা দেওয়া।

বাইরের লোক আর বলিস কেন। মণ্টু আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ টিপল। বল, বাবলাকে ভাঁওতা দেবার জন্য। মায়া-কুঞ্জে এসে লামডিং না জলপাইগুড়ির মেয়ে ঝি-গিরি করছে টের পেলে বাবলা একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।

না না, বাবলা আমাদের আশ্বাস দেওয়ার মতন করে ঘাড় নাড়ল। খবরটা দিতে গিয়ে কতক্ষণ তো ছিলাম আমি ওবাড়ি—দেখলাম ভাইঝিকে বেশ আদরেই রেখেছে পিণ্টুর জেঠি।

যাক গে, তুই যদি এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস, আমাদের কিছু বলার নেই—তবে বাপু আমরা কেউ ওখানে চা খেতে যাচ্ছিনে, এটা তুমি জেনে নিও। যেতে হয় তুমি একলা

যাবে। গিয়ে খুব করে জেঠির হাতের চা মিষ্টি খাবে। কি বলিস তোরা।

নিশ্চয়। আমার চোখের দিকে চোখ রেখে মণ্টু, শোভন তারাপদ ও মিহির ঘাড় কাত করল।

খাওয়াটা কবে শুনি? তারিখটা কবে ঠিক করে এসেছিস? বাবলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে শ্যামল প্রশ্ন করল।

পরশু, শনিবার বিকেলে। বাবলা বলল, কাল শুক্রবার আর একটা ম্যাচ খেলা আছে—আমাদের দলবেঁধে ওবাড়ি যাওয়ার অসুবিধা আছে—তাই শনিবার ঠিক করেছি। শনিবার আমরা সবাই ফ্রি।

আমরা চুপ করে রইলাম। তারাপদ আগের মতন পায়চারি করতে লাগল। বাবলা ঠিক বুঝতে পারছিল না, আমরা মায়া-কুঞ্জের নেমন্তন্নটা রাখব কি রাখব না। একটা অস্বস্তি নিয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে সে বার বার আমাদের মুখ দেখছিল।

বাবলা যে স্বপ্ন দেখতে ওস্তাদ তার প্রমাণ পেয়েছিলাম দু বছর আগে, ক্লাসে, আমাদের ইতিহাসের ঘণ্টায়।

ইতিহাসের মাস্টার বরদা নন্দী কিছু বদরাগী মানুষ নন। বাবলা সেদিন পিছনের বেঞ্চে বসে ঝিমোচ্ছিল—হঠাৎ বরদা স্যারের সেদিকে চোখ পড়ে গেল। বাস্!

এই যে বাবলাচন্দ্র! স্যার হুঙ্কার ছাড়লেন।

বাবলা ধড়মড়িয়ে মাথা সোজা করে বসল।

আমায় কিছু জিজ্ঞেস করছেন স্যার।

হুঁ, করছি বৈকি। জাঁহাপনা যে অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন।

বাবলা ভয় পেয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পিটপিট করে স্যারের মুখটা দেখে।

মণি যদি একদিন পদ্মগোখরো হয়ে ফণাটনা তোলে, আমাদের দোষ দিবি না কিন্তু, আমরা আগেই বলে রাখছি আমরা জানি, আমাদের কথা এখুন তোর খারাপ লাগছে।

না রে না! বাবলা আমাদের অভয় দিল। আমার কথা কিছু ভুল হয় না। শ্যামলদের পুকুরপাড়ে গাড়িটা মোড় ঘুরতেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের দেখে ও কেমন মিটিমিটি হাসছিল। তোরা তো সবাই তখন দেখলি—ওর ওই হাসিটাই কি বলে দিল না, এই মেয়ে একেবারে আলাদা, অন্য কারো সঙ্গে ওর মিল নেই, মনটা শিশুর মতন। ওই মেয়ে বন্ধু হতে জানে।

দেখা যাবে চাঁদ দেখা যাবে! যেন এই নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করা বৃথা। শেষবারের মতন বাবলাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সেদিনের মতন বনমালীর চায়ের দোকান থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম।

কথাটা কানে লেগে রইল। ওই মেয়ে বন্ধু হতে জানে। শিশুর মতন মন।

আমরা জানতাম, রাত্তিরের আলো নিবিয়ে মশারি খাটিয়ে বিছানায় শোবার পর বাবলার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়।

ক'দিন একটানা বাদলার পর সেদিন বিকেলে এমন টুকটুকে রোদ উঠেছিল, গাছে গাছে মেলা শালিক বুলবুলি কিচির মিচির করছিল, ঝাঁক বেঁধে ফড়িং ও প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছিল—কাজেই বাবলা ওই বিকেলে জেগে থেকেই স্বপ্ন দেখছিল।

রুবির হাসি।

বাবলার কি অজানা আছে, এই পাড়ার ছেলেদের দেখে এর আগে কত মেয়ে এমন মিষ্টি মিষ্টি হেসেছে! এখনও কেউ কেউ হাসে। কারো পরনে ম্যাক্সি, কারো মিনি, কেউ শ্ল্যাক পরে ঘুরে

বেড়ায়, কারো পরনে বেলবট্স। নাইলেক্স জর্জেট সিফন বেনারসীও কম কি! লুঙ্গি যোধপুরী আছে। সাজের অন্ত নেই।

পাড়াটা নেহাত ছোট নয় তো! অনেক মানুষ। কাজেই ছেলের সংখ্যা যত, মেয়ের সংখ্যাও তত।

না না, মেয়ের সংখ্যা যেন বেশি। না কি ওরা রঙ-বেরঙের হাজার রকম পোশাক পরেবেরোয় বলে সংখ্যাটা চোখে বেশি ঠেকে। অসম্ভব না। সময় সময় আমরা চিন্তা করি।

আমাদের ছেলেদের তো একরকম পোশাক। সেই ট্রাউজারস আর শার্ট। মাথায় একরকম বাবরি। গালে একরকম জুলপি। কারো মোটা কারো সরু—এই যা তফাত। ওদের নানা ঢঙের বেণী, একশ রকমের খোঁপা। তার ওপর বব করা চুল আছে, বয়েজ কাট মাথা আছে। একজনই আবার দিনে চার-পাঁচ রকম করে চুল বাঁধে—এ-ও চোখে পড়ে।

তা বাঁধুক যেভাবে খুশি চুল। ঈশ্বর এদের কেবল পোশাক পাল্টাতে আর চুল বাঁধার জন্য যখন তৈরী করেছে। এই নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।

আমাদের দুঃখ অন্য জায়গায়।

ঐ যে বাবলাকে পইপই করে সেদিন বারণ করলাম। রুবি রুবির জায়গায় থাক। ওকে নিয়ে বাবা তুই দিবাস্বপ্ন দেখিস না।

আমরা কি ভুলে গেছি, এর নাম যদি রুবি, আর একজনের নাম ছিল ডেইজি। বিয়ে হয়ে এখন কানপুর বরের সঙ্গে আছে। ঐ ডেইজির জন্য মণ্টুর মেজদা সুইসাইড করেছিল। মণ্টুর মেজদা আর ডেইজি এক নাগাড়ে আড়াই বছর চুটিয়ে ভালবাসাবাসির খেলা খেলেছিল।

এর নাম যদি রুবি, আর একজনের নাম ছিল পপি। ছিল মানে কি, এখনও আছে। রেডিওতে গান করে। থিয়েটার করে বেড়ায়। শোভনের ছোড়দার সঙ্গে গভীর প্রেম ছিল। এখন
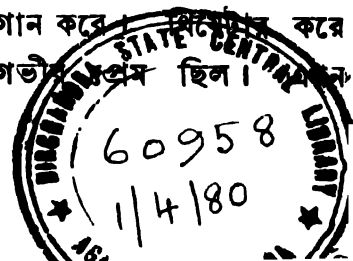
শোভনের ছোড়দা রাঁচীর পাগলা গারদে বসে আবোল তাবোল গান গায়। পপি ইদানিং এক অ্যাক্টরকে বিয়ে করেছে।...

এর নাম যদি রুবি আর একজন ছিল টুবলি। টুবলির জন্য দীপেনের মামা, প্রফেসর মানুষ, বিবাহিত—দু দুটো বাচ্চা ছিল নিজের, কিন্তু শেষটায় কী করল! ঐ কলেজেই টুবলী পড়ত যে। ছাত্রীর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে ভদ্রলোক বৌ ছেলেমেয়ে ও ঘরবাড়ি ছাড়ে। এখন সন্ন্যাসীর জীবন। মাদ্রাজের কোন্ এক বাবার আশ্রমে আছে। টুবলী কিন্তু বিয়ে-থা করে নি। এয়ার হোস্টেজ হয়ে আজ আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায়।

কাজেই মণ্টুর মেজদাকে, শোভনের ছোড়দাকে ও দীপেনের প্রফেসর মামাকে মনে রেখে আমরা ছোটরা, অর্থাৎ ওদের পরের জেনারেশনটা, বিশেষ করে ইয়াং-ইলেভ্ন্ ক্লাবের ক'টি ছেলে দারুণ সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। ম্যাক্সি, মিনি বেলবট্স বা সিপন নাইলেক্স পরা 'বাবু' 'বাবু' মেয়েদের দেখলে দূর দিয়ে হেঁটেছি। কি জানি, কে কার পাল্লায় পড়ে শেষটায় রাঁচী যাব কি পটাসিয়াম সায়নাইড খাব, বা কোন বাবা-টাবার আশ্রমে ছুটব। আমাদের ভয় করত।

কেননা চোখ মেললেই দেখি 'টুবলীর' জায়গায় আর এক 'বাবলী' দারুণ সেজেগুজে, হয়তো অবিকল টুবলীর মতন একটা চেন-বাঁধা কুকুর নিয়ে পাড়ার পার্কে ময়দানে সকাল বিকেল বেড়াতে বেরোচ্ছে, বা 'ডেইজির' জায়গায় 'লাভ্‌লি' নামের এক চমক লাগান মেয়ে বড় রাস্তার মোড়ে 'কুলপি বরফের' গাড়ি দাঁড় করিয়ে, একটা কুলপির দাম দিয়ে ফেরিওয়ালার কাছে দুটো কুলপি খাওয়ার আবদার জানাচ্ছে। আর তখন কেমন মিষ্টি মিষ্টি হাসি উপহার দিচ্ছে লোকটাকে, তাকিয়ে দেখার মতন। এমন মিষ্টি হাসি উপহার পাবার পর সামান্য একটা কুলপি খাওয়াতে কখনই আপত্তি করে না ফেরিওয়ালা—আমরা অনেকদিনই দেখেছি। ওই বয়সে

ডেইজিও—যার জন্য মণ্টুর মেজদা বিষ খেয়েছিল, মোড়ের মাথায় মিনি ফ্রক পরে দাঁড়িয়ে থাকত। তখন আমরা হাফ্ প্যাণ্ট পরে বই-খাতা বগলে স্কুলে যাই। মনে আছে মিনি ফ্রক পরা ডেইজি মোড়ের মাথায় কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে চীনাবাদাম-ওয়ালাকে ডেকে দু আনার বাদাম কিনত। এমন মিষ্টি করে বাদামের লোকটার দিকে তাকাত না ও! বাদামওয়ালা ঠিক আট আনার বাদাম একটা বড় ঠোঙ্গা ভরতি করে বত্রিশটা দাঁত বের করে হেসে ডেইজির হাতে তুলে দিত। স্কুলের বাকি পথটা যেতে যেতে আমরা বলাবলি করতাম, লোকটা কী বোকা রে! দু আনায় কত বাদাম দিয়ে দিল ডেইজিদিকে।

এখন বড় হয়ে বুঝতে শিখেছি বাদামওয়ালার চেয়েও কত বেশি বোকা ছিল মণ্টুর মেজদা।

কাজেই ডেইজির জায়গায় আর এক লাভলি যদি মোড়ের মাথা আলো করে দাঁড়িয়ে বাদামের বদলে আজ 'কুলপি' কেনে—আমরা দূরে দূরে থাকব জানা কথা।

তেমনি, আমরা যাকে পপিদি ডাকতাম, যার জন্য শোভনের ছোড়দা এখন রাঁচীর পাগলা গারদে বসে রাতদিন আবোল-তাবোল গান করে—সেই পপির জায়গায় ম্যাক্সি পরা এক রুবিকে দেখে আমরা কতকটা মাতাল হব।

রুবি ম্যাক্সি পরছে, পপিদিকে যোধপুরী পরে রাস্তায় একটা রাধাচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। কলেজে যাবে।

অ-মা! দেখতাম কি শোভনের ছোড়দাও একটা স্কুটার নিয়ে ভট্‌ভট্ ছুটে এসেছে। রাধাচূড়া গাছের কাছে এসে দু' চাকার গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ত, আর তক্ষুণি পপিও হর্স-টেল্ বেণীতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি তুলে লাফিয়ে স্কুটারের পিছনে চড়ে বসত। স্কুটারটা তক্ষুণি আবার ভট্‌ভট্ আওয়াজ তুলে বাতাসের আগে পালিয়ে যেত। আমাদের ছোটদের যে কী ভাল লাগত না দেখে!

না না, বসুন। বসে বসে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। তাতেই আমি খুশি থাকব। বরদা স্যার হাসছিলেন। তখন বাবলাও ফিক করে হেসে হাতের পিঠ দিয়ে চোখ দুটো বেশ ভাল করে রগড়ে নেয়। রগড়াবার পর স্যারের চোখের দিকে তাকায়।

বলুন এবার, বাবরের বাবা কে ছিল? স্যার প্রশ্ন করলেন।

আকবর স্যার। বাবলা এইবার উত্তর করল। ক্লাসের সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

বরদা নন্দীও হাসছিলেন।

কিন্তু বাবলা বেপরোয়া। তার কারণ ছিল। বাবলা আমাদের বলের ক্যাপটেন। সারাক্ষণ খেলাধুলার চিন্তা মাথায়। বলের তদারক করতে হয়, প্লেয়ারের কথা ভাবতে হয়, কে কোন্ প্লেসে খেলবে এই নিয়ে তাকে বেশ মাথা ঘামাতে হয়। কাজেই ইতিহাসের ঘণ্টায় স্যারের একটা দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি সে ভুল করে, আর তা শুনে আমরা হাসি, তাতে বাবলা খুব একটা ঘাবড়ায় না। বরং এমন চোখে তখন সে আমাদের দিকে তাকায়, যেন আমরা ইতিহাসের কটা পাতা মুখস্ত করা ছাড়া জীবনে আর কিছু জানি না, আর এসব ইতিহাস ভূগোল পড়ার পর আমরা কেউ কেরানী হব, কেউ বা উকিল-মোক্তার—তার বেশি কিছু নয়—বাবলা ফুটবল খেলায় নাম করে অষ্ট্রেলিয়ায় যাবে, ইংলণ্ডে যাবে ইণ্ডিয়ার হয়ে ম্যাচ খেলতে। শিগগিরই ইন্টারন্যাশনাল ফীগার হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে। আর কাগজের খেলার পৃষ্ঠা খুললেই, বাবলার নাম চোখে পড়বে। টেলিভিশনে বাবলার মুখ দেখা যাবে। বাবলা কিন্তু এখানে আমাদের মধ্যে পড়ে থাকছে না।

আচ্ছা, ভাল কথা, বাবরের বাপ আকবর ছিল। প্রাথমিক হোঁচটটা সামলে নিয়ে বরদা স্যার আবার বাবলাকে প্রশ্ন করেন, জাহাঙ্গীরের ছেলে কে ছিল?

মীরজাফর। বাবলা অক্লেশে উত্তর করল।

আবার ক্লাসসুদ্ধ হাসি।

কিন্তু হাসি থামতে আমরা দেখলাম বরদা স্যার আরও ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছেন। মুখটা লাল হয়ে গেছে। একটু পরে চেয়ার থেকে নেমে এসে আমাদের বেঞ্চগুলিব সামনে পায়চারি করলেন।

তারপর স্থির হয়ে দাঁড়ালেন।

আচ্ছা, বাবলাচন্দ্র, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি জান বলো তো?

অবাক হয়ে দেখলাম বাবলা মিটিমিটি হাসছে। জাহাঙ্গীরের ছেলেব নাম মীরজাফর শুনিয়ে মাস্টারমশায়কে সে দ্বিতীয়বাব হোঁচট খাওয়াল। এবং ক্লাসের সকলকে আর একচোট হাসাল। এতৎ সত্ত্বেও বাবলা এক ফোঁটা হাসল না। বরং হাসাচ্ছিল। তবে আমাদের বুকের ভিতর যে ঢিবঢিব করছিল অস্বীকার করব না। মজাও কম পাচ্ছিলাম না কিন্তু। বরদা স্যারেরই বা সেদিন কী হয়েছিল কে জানে। অন্যদিন হলে ব্ল্যাকবোর্ডের পিছন থেকে বেতটা টেনে নিয়ে বাবলার পিঠের ছাল তুলে ফেলতেন। না কি যে-কোন বাদশাদের সম্পর্কে ধারণার মূলে অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর শুনে সেদিন স্যাবের মাথায়ও আর একটু মজা করার ঝোঁক চেপে গিয়েছিল। তাই হবে, না হলে ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে স্যার তিন নম্বর প্রশ্ন করেন!

বাবলাও ইতস্তত করেনি। গড় গড় করে বলল, ঔরঙ্গজেব খুব শৌখীন বাদশা ছিলেন স্যার। তাঁর ফুলের শখ, পাখির শখ যেমন ছিল তেমনি মোটরগাড়ির শখও ছিল দারুণ। তিনি আগ্রায় একটা মোটরগাড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। তাছাড়া কুটীরশিল্পের মতন দিল্লীর প্রাসাদে বসে নিজের হাতে তিনি কাঠ ও ইস্পাতের টুকরো দিয়ে ছোট ছোট মোটবগাড়ি তৈরী করতেন। তারপর সেগুলি রাজ্যের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। রাজ্যশাসনের দিকে তাঁর একেবারে মন ছিল না। অতঃপর মারাঠা দস্যু শিবাজীর উৎপাতে তিনি বাধ্য হয়ে দিল্লী থেকে মহারাষ্ট্র

পর্যন্ত একটা ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন, যাতে ঐ সুড়ঙ্গপথে সশস্ত্র সৈন্যদল পাঠিয়ে মারাঠা সর্দারকে রাতারাতি পর্যুদস্ত করতে……

আমরা হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছিলাম। ব'দা স্যার বেজায় জোরে আমাদের ধমক দিতে লাগলেন। এমন কি কারো কারো পিঠে দু'একটা কিল চাপড়ও পড়ল। একটা ইম্পরটেণ্ট জিনিস নিয়ে ক্লাসে আলোচনা হচ্ছে আর ইডিয়টের মতন সব হাসছিস্! হাসি বন্ধ না করলে ক্লাস থেকে বের করে দেব। হ্যাঁ, বাবলা তুই বলে যা। কপালের ঘাম মুছে বরদা স্যার আবার বাবলার দিকে ঘুরে দাঁড়ান। বাবলা গড় গড় করে বলে চলল, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে বিচিত্র খেয়াল ও নেশার সমন্বয় ছিল। দেশ ভ্রমণ তাঁর আর এক দুরন্ত নেশা ছিল। তিনি একদা চীন পর্যটনে যান। সেখানে চু-এন-লাইয়ের পিতামহের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে……

থাক আর বলতে হবে না। যেন বিরক্ত হয়ে বরদা স্যার হাত উঁচু করলেন। কারণ, আমাদের হাসি থামছিল না। যদিও এবার ঘাড় নিচু করে মুখ লুকিয়ে আমরা গুজ গুজ করে সব হাসছিলাম, আর ওদিকে টিফিনের ঘণ্টা বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

হয়তো দুটো কারণে বাবলাকে থামতে বলে বরদা স্যার সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে হাসছিলেন—বুঝলি বাবলা, ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে এই নতুন তথ্যগুলি আমার একেবারেই জানা নেই। নিশ্চয় তুই কোনো সাহেব টাহেবের বই পড়ে এত সব জিনিস…

স্যারকে শেষ করতে দেয়নি বাবলা। সঙ্গে সঙ্গে সে আকাশ থেকে পড়ার মতন চেহারা করে বলে, কি বলছেন স্যার! কোনো হিস্টোরিয়ানের হিস্টরি বইয়ে এসব তথ্য আপনি পাবেন না তো। কাল রাত্তিরে হঠাৎ কেন জানি, মোগল বাদশা ঔরঙ্গজেবের কথা আমার খুব মনে পড়ছিল—তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের এই বিচিত্র দিকগুলি

আমি জানতে পারি। স্বপ্নের মধ্যে তাঁর আগ্রার বিরাট মোটরগাড়ি তৈরীর কারখানাটা, সেই সঙ্গে তাঁর প্ল্যান অনুযায়ী দিল্লীর যে জায়গায় সুড়ঙ্গ রেলপথ তৈরীর জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছিল—সব পরিষ্কার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আহা, আমি যদি এমন স্বপ্ন দেখতে পেতাম। বরদা স্যার ক্লাস থেকে বেরোবার মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। সারা জীবন ইতিহাস মুখস্ত করে গেলাম, আর ক্লাশে এসে তোদের সামনে সেগুলো বমি করলাম শুধু। ইতিহাসের সোনার খনির সন্ধান আজও পেলাম না রে।

পাবেন স্যার পাবেন। বাবলা গম্ভীর হয়ে স্যারকে উপদেশ দিয়েছিল! -আমার মতন স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করুন। দেখবেন ইতিহাসের আরও কত কি অজানা জিনিস আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। স্বপ্নের মতন ইণ্টারেষ্টিং এই জগতে আর কিছু আছে নাকি স্যার।

তা বটে। গুজগুজ করে হেসে বরদা স্যার টিচার্স রুমের দিকে ছুটে গেলেন। যেন অন্য স্যারদের কাছে তক্ষুণি বাবলার স্বপ্নের গল্পটা না করলে তাঁর পেটের ভাত হজম হচ্ছিল না।

সাবাস! সাবাস ক্যাপ্টেন! মনে আছে, সেদিন টিফিনের আধঘণ্টা সময় বাবলাকে কাঁধে তুলে নেচে কুঁদে আমরা ক্লাসরুমটাকে মাথায় তুলেছিলাম। যদিও সে বছর অ্যানুয়াল পরীক্ষায় বাবলার ইতিহাসের খাতায় বরদা স্যার একটা বেশ বড়সড় ঘোড়ার ডিম বসিয়ে দিয়েছিলেন—তা হলেও স্যার নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন, এখনও হয়তো করেন, বাহাত্তর সালের জুলাই মাসের এক বুধবার দুপুরে ক্লাস টেনে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে তিনি যে অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করেছিলেন, এমন আনন্দ আর কোনদিন পাননি এবং ভবিষ্যতেও পাবেন এমন আশা করেন না। কেননা, এর পরের বছরই আমরা স্কুল ছেড়ে দিই কিনা।

সুতরাং ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে বাবলার স্বপ্ন দেখার কথা মনে রেখে আমরা, ইয়াং-ইলেভ্‌ন্‌-এর বন্ধুরা, *পিণ্টুর জেঠির বাড়ির ব্যাপারটা* নিয়ে নতুন করে চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

সেবারের স্বপ্ন বরদা স্যারের পরীক্ষার খাতার ওপর দিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এবার দেখছিলাম, আমাদের ক্লাবের ওপর স্বপ্নটা এক-একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে।

আগের একটা ম্যাচ খেলায় দত্তপুকুরের কাছে দুটো গোল খেয়েছিলাম।

শুক্রবারের খেলায় নিমতার ইয়ং-ফ্রেণ্ডস্‌-এর কাছে পাঁচ গোলে হেরে গেলাম।

কেউ বিশ্বাস করবে?

চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাঠ থেকে উঠে এসেছি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কোনো ফুটবল কম্পিটিশনে ইয়াং-ইলেভ্‌ন্‌ নাম পাঠাবে না। ফুটবল খেলাই ছেড়ে দেব আমরা।

ক্লাব! ক্লাবটা ভেঙে দেব কি? আমাদের যে আশা-ভরসা, ক্যাপ্টেন—খেলাধুলায় তার আর মন নেই। সতেরো বছরের একটা ম্যাক্সিপরা মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এই খোয়ারি না ভাঙলে আবার ইয়ং-ইলেভ্‌ন্‌কে দাঁড় করানো শক্ত হবে।

ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেলাম।

সন্ধ্যার পর ক্লাবঘরে আর ঢুকলাম না। ঘরটার দিকে তাকাতে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। নিমতার একটা পচা টিমের কাছে পাঁচটা গোলে হেরে কোন্‌ লজ্জায় আবার ক্লাবঘরে ঢুকব। ইয়াং-ইলেভ্‌ন্‌-এর ট্র্যাডিশন আমরা ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছি যে। আমাদের মরে যাওয়া উচিত।

সবটা রাগ গিয়ে পড়ল বাবলার ওপর। বাবলাকে লুকিয়ে চুপি চুপি ক'জন বনমালীর চায়ের দোকানের পিছন দিকের—মেয়েরা বসে টসে চা খায়—পর্দাঘেরা একটা খুপরিতে গিয়ে আলোচনায় বসলাম। অতঃপর কি করা যায়। যা হোক একটা ব্যবস্থা না করলে কিছুতেই যে চলছে না।

কাল আবার পিণ্টুর জেঠির গাড়ি চায়ের নেমন্তন্ন। কথাটা আমাদের মনে ছিল। বাবলাকে তখন পর্যন্ত পষ্টাপষ্টি হাঁ বা না কিছু জবাব দেওয়া হয়নি। জিনিসটা আমাদের বিবেচনাধীন ছিল। যেন আমাদের ভিতরে ভিতরে আশা ছিল যদি শুক্রবারের খেলায় নিমতার ইয়ং-ফ্রেণ্ডসকে হারাতে পারি—তাহলে, বাবলা যেমন সাধাসাধি করছে, শনিবার বিকেলে সবাই মিলে চায়ের নেমন্তন্ন খেতে একবার মায়া-কুঞ্জে ঘুরে আসা যেতে পারে।

একদিনের তো মামলা, তাও আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট আমরা ওখানে থাকব। অনেকদিন পর পিণ্টুর জেঠির সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপও করা যাবে।

পিণ্টু বেঁচে থাকতে আমরা ওবাড়ি কম গিয়েছি। ছোট ছিলাম। পিণ্টুর জেঠা আমাদের দেখলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। কি জানি যদি তাঁর বাগানের ফুল বা ফলের গাছটাছ নষ্ট করে দিই।

তবে তিন চার দিন আগে বাবলা যখন মায়া-কুঞ্জের ফটক খুলে সুটকেশ দুটো হাতে ঝুলিয়ে পিণ্টুর জেঠির ভাইঝিকে নিয়ে বাড়ির ভিতর ঢোকে, একপলক বাগানটা দেখতে পেয়েছিলাম। এখন বাগানটার যা হাল হয়েছে না!

যাক, মায়া-কুঞ্জের বাগানের ভাবনার চেয়ে অনেক বড় ভাবনা, জটিল চিন্তা আমাদের মাথায়।

মণ্টু বলল, ইচ্ছে করে আজ ফার্স্ট-হাফেই দু-দুটো বল ছেড়ে দিয়েছিল বাবলা। এখন তার আর কোনো গরজই নেই, আমরা কোনো খেলায় জিতি।

মানে জেদ করে, আমাদের ওপর আক্রোশ নিয়ে সে এমনটা করছে তোরা বলতে চাস? শোভন কটমট করে সকলের মুখ দেখছিল।

আমার তো তাই মনে হয়। দীপেন ঘাড় কাত করল। ঐ যে পাড়ার ডেইজিদি পপিদি টুবলীদিদের কথা বলে, তাদের কীর্তির কথা শুনিয়ে কাল তাকে সাবধান করতে গিয়েছিলাম—

মায়া-কুঞ্জের দিকে নজরটা কম দিতে পরামর্শ দিচ্ছিলাম— এতেই ভেতরে ভেতরে আমাদের ওপর বাবুর রাগ। আশা করেছিল কি যেন নাম ওই মেয়ের—রুবি, রুবির ব্যাপারে আমাদের কাছে বেশ একটু উৎসাহ-টুৎসাহই পাবে—আমাদের জন্য ওবাড়ির চায়ের নেমন্তন্ন বাগিয়ে নিয়ে এসেছে—শোনামাত্র হৈ-চৈ করে সবাই সেখানে সবাই ছুটে যাব– এখন দেখছে এভাবে নেমন্তন্ন খেতে যেতে আমাদের ঘোর আপত্তি—এসব নানা কারণে মেজাজ খারাপ করে শুয়োরটা খেলাটাই আজ নষ্ট করে দিলে।

তারাপদ গরম একটা নিশ্বাস ছাড়ল। আমার ইচ্ছে করছে কি পাজীটাকে এখানে ধরে এনে আচ্ছা করে ধোলাই লাগাই। তার স্বপ্ন দেখা বার করে দেই।

মেয়ে নিয়ে নিয়ে স্বপ্ন—এই স্বপ্নই ওর সর্বনাশ করে ছাড়বে। তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে শ্যামল আক্ষেপ করে একটা চুক চুক শব্দ করল।

তবু বুঝতাম, আমি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলাম, যদি টানটা আমাদের এদিকের বস্তিটস্তির কোন শান্তা বা জোনাকী কি পুতুল-টুতুলের দিকে থাকত—এতটা দুশ্চিন্তা করতাম না। দুশ্চিন্তাই করতাম না। কেননা, ওরা অনেক ঠাণ্ডা মেয়ে। বেবি টেবি টুবলী বাবলী বা রুবির জাতের মেয়েদের দিকে হাত বাড়ান আর আগুনে হাত দেওয়া এক কথা।

থাক থাক, রাস্কেলটাকে বুঝিয়ে কিছু ফল হবে না, পোড়ে পুড়ুক,

মরে মরুক—আমাদের কিছু এসে যাবে না। শোভন গম্ভীর হয়ে বলল, এখন ইয়াং-ইলেভ্ন-এর কথা আমাদের ভাবতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আর একটা হাফ-ব্যাক জোগাড় করতে হবে। বাবলা থাকল না, কি মন দিয়ে খেলছে না দেখেও তাকেই আমাদের আঁকড়ে থাকতে হবে, এর কোনো অর্থ হয় না। দলের ক্যাপ্টেন যদি চলে যায় কি মরে যায় তো তার জায়গায় আর একজনকে দলের দায়িত্ব নিতে হয়। এইজন্য দুঃখ করে হায় আফশোস করে কিছু কাজ এগোবে না।

তা এগোবে না—খুবই সত্য কথা। আমি বললাম, কিন্তু তবু যেন—

কথাটা মুখ দিয়ে বের করি না, তক্ষুণি আবার থেমে গিয়ে একটা অস্বস্তি উৎকণ্ঠা ও হতাশার দৃষ্টি নিয়ে বন্ধুদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার মনের কথাটা তারা বুঝতে পারে। যে জন্য তারাও হঠাৎ চুপ করে গেল।

ফলে পর্দা ঘেরা খুপরির আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে উঠল।

আমি বললাম, সরলতা, সাহস, সারাক্ষণ হাশিখুশি মেজাজ এবং পরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত—এত সব গুণ এক সঙ্গে যদি কারো মধ্যে থাকে তো এক বাবলা ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কে আছে। এটা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি কি। সুতরাং আমাদের মধ্যে বাবলা নেই, বাবলা থাকবে না, তার অর্থ আমরা অনেক কিছু হারালাম, আমাদের অনেক কিছু চলে গেল।

স্বপন বলল, আমার মনে হয় আর একটু ধৈর্য নিয়ে আমাদের এগোনো উচিত। বাবলা সম্পর্কে এখনি একটা চূড়ান্ত কিছু করাটা ঠিক হবে না।

কিভাবে আর ধৈর্য রাখি বল্। তারাপদ মাথা ঝাঁকাল। একমাত্র ওর জন্য দু' দুটো ম্যাচ খেলায় আমরা হেরে গেছি।

আমার মনে হয়—বেশ কিছুটা সময় চুপ করে থাকার পর মিহির

বলল, আমাদের একবার ওখানে যাওয়া উচিত। বাবলার বন্ধু হিসেবে আমাদের সবাইকে যখন পিণ্টুর জেঠি চা খেতে ডাকছে—নাহয় সবাই মিলে গেলাম।

তারপর? মণ্টু ভুরু কুঁচকোল। লাভটা কি হবে। একটা বিস্কুট ও এক কাপ চা-এর বেশি কিছু দিয়ে পিণ্টুর জেঠি তোদের সমাদর করবে আশা করছিস নাকি।

চা খাওয়াটা কিছু না। মিহিরের মনের ভাবটা আমি বুঝলাম। বললাম, তাতে একটা ফল হবে—সামনাসামনি আমরা ওকে দেখতে পাব। হয়তো আমাদের সঙ্গে ছুটো একটা কথাও বলবে লামডিং না শিলিগুড়ির মেয়েটি। আমরা বুঝতে পারব বাস্তবিক ওর নেচারটা কেমন একদিনের আলাপে মেয়েদের বোঝা যায় না যদিও—তা হলেও অন্ততঃ কিছুটা যদি আন্দাজ করতে পারি।

কিছুই আন্দাজ করা যাবে না। শোভন লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল। বলে কিনা আমার ছোড়দা পপির সঙ্গে, আলাপ বলে আলাপ, মেলামেশা করে ছুজনের সম্পর্কটাকে একেবারে ডালভাতের সামিল করে ফেলেছিল—তবু ছোড়দা কতটা চিনেছিল ওকে—ঘোল খাইয়ে ছাড়ল আমার ভাইকে ওই ডেভিল মেয়েটা।

আমার প্রফেসর মামা। দীপেন বলল, এত মেলামেশা, ছুজনে এত সব কীর্তি করে মামা কতটা চিনতে পেরেছিল টুবলী নামের সুন্দরীকে।

হুঁ, কতটা চিনতে পেরেছিল আমার মেজদা ডেইজিকে? আড়াই বছর চুটিয়ে প্রেম করেছিল ছুজনে।

তা হলেও আমাদের হাল ছাড়লে চলবে না। গলায় জোর দিয়ে বললাম, অন্তত বাবলাকে বাঁচাবার জন্য যতভাবে চেষ্টা করার আমাদের করতে হবে। আমরা বলছি বটে পিণ্টুর জেঠির ভাইঝিকে বাবলা একদম চিনতে পারছে না—কেবল স্বপ্নই দেখছে ওকে নিয়ে।

কিন্তু সেদিন দূর থেকে এক নজর দেখে আমরাই যে মেয়েটিকে ষোল আনা চিনে গেছি, তা-ই বা বলি কেমন করে। ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে বাবলার স্বপ্ন দেখার সঙ্গে, কি নাম যেন এর, রুবিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার অনেক তফাত থাকতে পারে বলা যায় কি। •হয়তো এই মেয়ে, হোক পয়সাঅলা ঘরের বা ম্যাক্সি-মিনি পরুক—পপি ডেইজিদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা—যে বলছে সুইট, সফ্‌ট নেচার—হতেও তো পারে।

আমাকে দেখিয়ে মিহির বলল, আমিও সোমেনের সঙ্গে একমত। মায়া-কুঞ্জের নেমন্তন্নটা ছেড়ে দিয়ে লাভ নেই। ঘুরে তো একবার আসা যাক। সামনাসামনি জেঠির ভায়ের মেয়েকে একবার দেখে আসি।

স্বপন বলল, তবে তাই হোক—বাবলা যখন বলছে ওই রুবিটির মধ্যে কোন খাদ নেই—সবটাই সোনা—সুতরাং বাবলার স্বপ্ন কতটা খাঁটি আর ওই রুবিই বা কতটা নিখাদ পরীক্ষা করতে হলে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে।

স্বপনের কথা শেষ হল না। পর্দাটা নড়ে উঠল। সবাই চমকে উঠলাম। বাবলা ভিতরে ঢুকল।

বাবলা আমাদের দেখে হো-হো করে হেসে উঠল। চানটান করে এসেছে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী আর পাজামা। গলায় ঘাড়ে পাউডারের ছোপ।

আমাদের গায়ে তখনও খেলার পোশাক। হাতে পায়ে ধুলোমাটি। ক্লান্তি ও অবসন্নতার ছাপ চোখে মুখে।

আমরা খেলায় হেরে গেছি। বাবলাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি।

আর সেই বাবলা এর মধ্যেই কেমন তাজা টাটকা হয়ে পোশাক-

পোশাক বদলে সারা মুখে একটা ঝরঝরে হাসি ঝুলিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির।

অবাক না হয়ে করতাম কি!

কি করে তুই টের পেলি আমরা এখানে বসে আছি?—আমি না বলে পারলাম না।

ক্লাব ঘরে তালা ঝুলছে—কাজেই অনুমান করলাম বনমালীর দোকান ছাড়া কোথায়ই-বা আর সোনাচাঁদদের আড্ডা দেবার জায়গা আছে। তাই সরাসবি এখানে চলে এলাম। দোকানে ঢুকতেই বনমালী খুপরিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

তারপর? শোভেন বলল, আমাদের দেখে কী মনে হচ্ছে তোর! খেলায় হেরে এসে এখানে বসে লুকিয়ে খুব করে মোগলাই পরটা আর মুরগির ঝোল সাঁটছি?

না, তা মনে করব কেন। একটা চেয়ার টেনে বাবলা বসে পড়ল। এখানে বসে আমার মুণ্ডপাত করা হচ্ছিল, তোদের চোখ দেখেই তো টের পাওয়া যাচ্ছে।

কেন, তোর তোর মুণ্ডপাত করতে যাব কোন্ দুঃখে। মিহির বলতে যাচ্ছিল—আমরা অন্য একটা বিষয় নিয়ে—

থাক, আর লুকোতে হবে না বন্ধু। বলে কিনা স্বপ্নের মধ্যেই আমি কত কি দেখতে পাই, আন্দাজ করতে পারি—আর এ তো জলজ্যান্ত দশটা মুখ চোখের সামনে দেখছি।

দ্যাখ্, বাবলা? স্বপন বলল, তোর স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। সেটা বরদা স্যার পারতেন। সেখানে বাদশা-টাদশাদের নিয়ে যেসব স্বপ্ন দেখতিস, বরদা স্যার সেগুলোর কদর বুঝতেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় তোর সামনা-সামনি দেখা জিনিসগুলোর মধ্যে অনেক সময় ভুল থেকে যায়।

হতেই পারে না। বাবলা জোরে মাথা ঝাঁকাল। কেবল

কথায় তো হবে না, আমার দেখার মধ্যে ভুল থাকে—যদি তেমন প্রমাণ দেখাতে পারিস তবে তো বুঝব।

যাক গে, এসব নিয়ে এখন কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই-যখন প্রমাণ দেখবার সময় আসবে তখন নাহয় দেখা যাবে। চা খাবি ?

হুঁ, খাব বৈকি।

বনমালীর ছোকরা বয়কে ডেকে চায়ের কথা বলে দিলাম।

আমরা খেলা নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছি। বাবলার চোখে চোখ রেখে মুখটা কালো করে ফেললাম। বুঝেছিস, দু দু'টো ম্যাচ খেলায় হেরে গেছি—ইয়াং-ইলেভ্‌ন্ এখন বাইরে তো নয়ই, পাড়ার মানুষের কাছেও লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না।

ধেৎ! বাবলা ধমক লাগাল। লজ্জা আবার কি! খেলা—খেলা, খেলায় হার-জিত থাকবেই। ইয়াং-ইলেভ্‌ন্-এর খেলোয়াড়রা মেয়েছেলে নয় যে এই জন্য পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পাবে।

তুই যত সহজে জিনিসটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারিস, আমরা পারি না। তারাপদ বলল।

তা আর পারবে না কেন। মণ্টু ফোড়ন কাটল। বাবলার মনে এখন অন্য খেলা।

হুঁ, তা তো বটেই।

চা এসে গেল। কাপে বড় একটা চুমুক দিয়ে বাবলা আমাদের মুখের দিকে তাকাল। হাসল। ছাখ্, বারো বছর বয়স থেকে মাঠে ছুটোছুটি করে ফুটবল খেলছি—এখনো যদি ঐ এক বল খেলা নিয়েই মেতে থাকি, তবে আর করলামটা কি! ফুটবলের চেয়েও কি আমাদের জীবনে ভাল খেলা বড় খেলা সুন্দর খেলা থাকতে নেই ?

তা-ও বটে! শোভন চোখ পাকাল। যেন মোটেই টিককিরি দিচ্ছে না। বেজায় সীরিয়াস সে। মুখের এমন একটা ভঙ্গি করে বলল, খুব দামী কথা বলেছে বাবলা। ফুটবল খেলার চেয়েও

বড় খেলা সুন্দর খেলা আছে মানুষের জীবনে। বাবলা সেই সুন্দর খেলায় মেতে গেছে—আমাদেরও খেলতে ডাকছে, কেমন না বাবলু!

নিশ্চয়! হাত থেকে কাপটা নামিয়ে বাবলা হি-হি করে হাসল। আমি তো গত মঙ্গলবার থেকেই তোদের খেলতে ডাকছি। তোরা যদি সাড়া না দিস, আমি কি করতে পারি বল্!

ঠিক আছে। আমার দেখাদেখি মিহির, স্বপন, দীপেন, এমন কি মণ্টুও উৎসাহে মাথা ঝাঁকাল। কাল বিকেলে আমরা মায়াকুঞ্জে চায়ের নেমন্তন্ন খেতে যাব। এই নিয়ে আর আমাদের মধ্যে কোনোরকম মতবিরোধ থাকল না।

ওয়াণ্ডারফুল! বাবলার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। সে যে কত খুশি হয়েছে, তার চেহারা দেখে বোঝা গেল। আমি তাই চাইছি স্বপন, আমার তাই ইচ্ছে মণ্টু—কোনো ভাল কোনো জিনিস সুন্দর জিনিসই একা একা দেখার, একলা উপভোগ করাব স্বভাব নয় আমার, তোরা জানিস। তোদের সকলকে নিয়ে আমি সুখী হতে চাই, আনন্দ করতে চাই—তা না হলে আমাব ভীষণ অস্বস্তি ঠেকে।

না, তা আমরা অস্বীকার করছি নে। আমি বললাম, তা না হলে আর তুই আমাদের ক্যাপ্টেন কেন। তোকে সামনে রেখে আমরা এতকাল চলে এসেছি—

এখনো চলবি! যেন আবেগে বাবলার দু' চোখ ছলছল করে উঠল। তোদের ফেলে রেখে, তোদের ছেড়ে দিয়ে এক পা আমি কোথাও এগোতে চাই না। ফুটবল খেলাটা কিছু নয়। আজ হেরে গেছি, কাল আবার জিতব। জিততেই হবে। ইচ্ছে করলেই সেটা সম্ভব। কঠিন না। কিন্তু এক জায়গায়—আমরা না, আমাদের দাদারা, আমাদের আগের জেনারেশনটা ভয়ানক ভাবে হেরে গেছে, মার খেয়েছে—পপিকে দিয়ে শোভনের ছোড়দা, ডেইজিকে

দিয়ে মণ্টুর মেজদা, টুবলিকে দিয়ে দীপেনের মামা। ভাবলে কতখানি দুঃখ হয় মনে।

বাবলার গলার স্বর হঠাৎ বক্তৃতার মতন শোনায়।

আমরা কান পেতে শুনি।

কাজেই বাবলা বলে চলল, আমরা কিন্তু হারছি নে। আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আমরা এমন কাউকে আমাদের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি—যে সত্যি সুন্দর, কেবল বাইরেই নয়, ভেতরেও সে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। ফুল। ঐ ছোট্ট মানুষটিকে বন্ধু হিশাবে পেলে আমরাও সুন্দর হব। সার্থক হব। দেখবি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গেছে।

এক সেকেণ্ড থেমে থেকে বাবলা আবার বলল, অন্তত আমার তাই ধারণা। দুদিন তাকে সামনে থেকে দেখেছি, একটা দুটো কথাও বলেছি। রুবির তুলনা হয় না। আমার দেখা ভুল হবে, কিছুতে আমি বিশ্বাস করব না।

ঠিক আছে—তোর বিশ্বাসে বিশ্বাস রেখে আমরা এগোব। আমি ঘাড় কাত করলাম।

হুঁ, ভাল কিছুতে বিশ্বাস করে মরাও ভাল। তারাপদ লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল।

তাছাড়া, এটাও তোরা দেখবি, স্বপন বলল, বাবলার জিদ—একলা ওই মেয়েকে আঁকড়ে থেকে নিজের ভাল, সার্থকতা, আনন্দ বা তৃপ্তি পেতে চাইছে না। সে চাইছে আমাদের সকলের বন্ধু হোক পিণ্টুর জেঠির ভাইঝি। ওর ভালবাসার আনন্দ আমরা সবাই ভাগ করে নিই।

তা আর স্বীকার করছে কে—মণ্টু গম্ভীর হয়ে বলল, বাবলার বন্ধুপ্রীতি, ত্যাগ, পরার্থপরতা, অনেক সময় নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও আর পাঁচজনের উপকার করা, সবাইকে সাহায্য করা—এই সব গুণ নিয়ে বাবলা অদ্বিতীয়।

মণ্টু খুব গ্যাস দিচ্ছে আমাকে—ঠাট্টা করছে। বাবলা রাগ

করল না। মুখটা হাসি হাসি রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, তা তো বটেই—একটি সুন্দর মানুষের কাছে তোদের সবাইকে নিয়ে যেতে চাইছি—পরিচয় করিয়ে দেব—এখানেই আমার তৃপ্তি। আমি এটাই প্রমাণ করব—শোভনের ছোড়দার মতন, মন্টুর মেজদার মতন বা দীপেনের প্রফেসার মামার মতন আমি মানুষ চিনতে ভুল করি না।

ঠিক আছে। আমরা যাব। বাবলাকে আশ্বাস দিয়ে বনমালীর দোকান থেকে এক সঙ্গে সব বেরিয়ে এলাম।

পরদিন শনিবার। আবহাওয়াটা চমৎকার। বিকেলটার তো কোনো তুলনাই চলে না।

এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। করমচা রঙের ছিটে ছিটে বাহারী রোদ। গাছে গাছে পাখির কিচিমিচির। ঝাঁক বেঁধে হলদে প্রজাপতি আর লাল ফড়িং উড়ছিল।

সেই প্রথম দিন বিকেলের মতন। রুবি যেদিন ঢাউস দুটো সুটকেশ নিয়ে কচি পাতার রঙের একটা ডজ গাড়ি থেকে নেমে আসে।

সেদিন আমরা দূরে দূরে ছিলাম। একলা শুধু বাবলাই এগিয়ে গিয়েছিল নতুন মানুষটির সামনে। আজ সবাই আমরা একসঙ্গে তার কাছে যাচ্ছি।

বাবলা আগে আগে হাঁটছিল। হাওয়ায় সদ্যফোটা কদম জুঁইয়ের গন্ধ ও রজনীগন্ধার সুবাস আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে টের পেলাম। একটু পরে ওয়াটার লিলি ফুটবে। কামিনী ফুটবে। সন্ধ্যার দিকে গুচ্ছ গুচ্ছ রং দুলালী।

চিরকাল শ্রাবণের বিকেলে আমাদের পাড়াটা এমন রঙে গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে।

মনে আছে, এই সময় বড় বড় বাড়ির পপি ডেইজি টুবলীদিরা কীরকম চড়া সাজগোজ করে রাস্তায় বেরোত।

তেমনি ওদিকের বস্তি-টস্তির শান্তা, জোনাকী, পুতুলদির মতন ঠাণ্ডা মেয়েরাও বেশ একটু সেজেগুজে থাকত। এদিক ওদিক বেড়াত। তবে সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘরে ফিরে গিয়ে সুর করে লক্ষ্মী-ঠাকরুনের পাঁচালী পড়ত। মা-পিসিদের সঙ্গে বসে গল্প করত।

আব চড়া সাজ নিয়ে পপি ডেইজিরা এর গাড়িতে চড়ে, ওর মোটরবাইকের পিছনে চেপে নাইট-শো সিনেমা দেখতে গেছে, কলকাতার হোটেলে রোস্তারাঁয় খেতে গেছে। কত রাত্রে ফিরত বলতে পারতাম না। লেখাপড়া সেরে আমরা বাচ্চারা ভাত খেয়ে ততক্ষণে ঘুম।

আজও নিয়মের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। পপিদির ছোট বোন মুন্নি সেজেগুজে বাড়ির গেট-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ডেইজিদির ছোট বোন ইরানি ফ্রক পরে গেট-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টুবলির ছোট বাবলি চমকা রঙের লুঙ্গি পরে রাস্তা আলো করে পার্কের সমনে ঘুরছে। উঁহু, তারা কেউ বন্ধু খুঁজে পাচ্ছে না। পাবে না। কি করে পাবে!

বন্ধু পেতে হলে আমাদেরই ডাকতে হবে। কিন্তু শোভনের ছোড়দাকে দেখে, মন্টুর মেজদাকে দেখে, দীপেনের মামাকে দেখে আমাদের খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

ওই সব চটকদার সাজ দেখে কটাক্ষ দেখে মিষ্টি হাসি দেখে আমরা তো ভুলছি না।

ওদিকে টালির ঘরের শান্তার ছোট বোন পিয়াল অ্যাদ্দিনে মাথায় বেড়ে উঠে সাড়িটারি পরে দোরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে বিকেল পড়তে। জোনাকীর ছোট বোন শর্মিষ্ঠা কত লম্বা ছিপছিপে হয়ে উঠেছে। পাতার টিপ পরে চোখে কাজল বুলিয়ে সেজেগুজে

বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে খেলার ছলে খুব দৌড়ঝাঁপ করছে এদিক ওদিক। তেমনি পুতুলদির ছোট বোন ডালিয়া। বেলবটস পরছে কদিন ধরে, আর বিকেল পড়তে পার্কের দিকে হাওয়া খেতে যাচ্ছে।

না, ওদের দিকেও আমাদের চোখ নেই। দু'দিন পর ওদের ঘরের চালের মাথায় গাছের আগায় অগুনতি টুনি বাতি জ্বলবে, সানাই বাজবে, বেনারসী পরে চন্দনের ফোঁটায় কপাল চিত্রি করে ছাঁদনাতলায় গিয়ে বসবে ওরা। আমাদের আসা ভরসা সেখানেই শেষ। তারপর রাত না পোহাতে দেখব এক-একজন মা হয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে, আর পানদোক্তার রসে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে আমাদের দেখে ফিক ফিক হাসছে।

কাজেই আমরা, আমাদের জেনারেশনটা, ইয়াং-ইলেভ্ন্-এর ক'টি বন্ধু ডাইনেও হেলছি না, বাঁয়েও হেলছি না।

টালির বাড়ির দিকেও আমাদের চোখ নেই।

আবার বড় বড় ফটকওয়ালা বাগানওয়ালা গ্রিল-দেওয়া ব্যালকনি ঝোলান বাড়ির দিকেও অমরা নজর দিচ্ছি না। ইচ্ছে করেই দেই না।

আমরা আমাদের মতন আছি। খেলাধূলা নিয়ে মত্ত।

এতকাল ক্রিকেট ফুটবল খেলেছি। আজ আরও বড় খেলা, ভাল খেলা, সুন্দর খেলার জন্য তৈরী হচ্ছি। যাতে জীবন সার্থক হয়, জীবনে পরিতৃপ্তি আসে, শান্তি পাওয়া যায়।

জীবন নিয়ে ভাববার বয়স হয়ে গেছে আমাদের। বাবলার কথা।

তাই বুঝি আমাদের ক্রিকেট ফুটবলের ক্যাপ্টেন বাবলা আজ আবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। মায়া-কুঞ্জের দিকে যেতে যেতে কথাগুলি ভাবি।

বাবলা আগে আগে হাঁটছিল। নীল ট্রাউজারের সঙ্গে সাদা সার্ট।

আমাদেরও একই পোশাক।

বাবলার পিটটা চওড়া, মাথার পিছনটা চৌকোণ। অনেকটা

গ্রীক প্যাটার্নের শরীর। আর একটু উঁচু লম্বা হ'লে কথা ছিল না। জগৎ জয় করতে পারত সে।

সত্যি বাবলার একটা মন। হৃদয় বলব। বন্ধুদের সুখী করতে সব করতে পারে সে। কেবল বন্ধু কেন। দরকার হলে শত্রুর জন্যও। উপকার করার সময় আমাদের ক্যাপ্টেনের, কত তো দেখলাম, শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না।

শোভনের ছোড়দাকে নিয়ে পপিদির ঐ কীর্তির পর থেকে পপি এবং ওদের বাড়ির সবাইকে আমরা দারুণ ঘেন্না করতাম। শত্রুজ্ঞান করে ওদের কাছ থেকে সাত হাত দূরে থেকেছি।

আর সেই পপির ছোট ভাই টোপন একদিন দুপুরবেলা শ্যামলদের পুকুরের ধারে আর দুটো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে হুটোপাটি করে খেলতে গিয়ে হঠাৎ জলে পড়ে যায়। পুকুরপাড়ের একটা কদমগাছের নিচে বসে আমরা বড়রা আড্ডা দিচ্ছিলাম। টোপন জলে ডুবে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে বাবলা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পুকুরে লাফিয়ে পড়ে টোপনের চুলে ধরে জল থেকে তুলে আনে। টোপন বাঁচল। কিন্তু বাবলার অবস্থা ? এত বড় একটা কাঁচের টুকরো ডান পায়ের পাতায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বিঁধে গেছে। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটছিল। তক্ষুণি একটা সাইকেল-রিক্সায় তুলে বাবলাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। তিনমাস ঐ পা নিয়ে সে ভুগেছিল। এইজন্য আমাদের কাছে কম গালাগালি খায়নি। কি দরকার ছিল পপির ভাইটাকে জল থেকে টেনে তোলার। মরত, আপদ যেত। বন্ধুদের গালাগাল খেয়ে বাবলা রাগ করত না। হাসত শুধু।

আর একদিন। ডেইজিদির বাবাকে একটা পাগলা কুকুরে তাড়া করছিল। কুকুরের হাত থেকে বুড়োকে রক্ষা করতে গিয়ে কুকুরটাকে যেই না মারতে গেছে, অমনি ঘাড় ঘুরিয়ে কুকুরটা বাবলার পায়ে কামড় বসিয়ে এতটা মাংস খুলে নেয়।

সেই পা নিয়ে ছ মাসের বেশি ভুগেছিল বাবলা আর কলকাতার ট্রপিকেল হাসপাতালে ছুটে ছুটে গিয়ে পেটের মধ্যে চৌদ্দটা ছুঁচের ঘাই নিয়েছিল। ডেইজি আমাদের শত্রু। ওর জন্য মণ্টুর মেজদা সুইসাইড করে। আর ওই শত্রুর বাপকে বাঁচাবার জন্য কিনা বাবলা—সেবারও খুব গালমন্দ করেছিলাম তাকে সবাই মিলে। গালমন্দ গায়ে মাখেনি। যা তার স্বভাব। হেসেছিল।

তাই এক-এক সময় মনে হয়েছে, বাবলা মানুষ নয়। ঈশ্বর বলব না যদিও। তবে ঈশ্বরের দূত যে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে ভিতরটা এত সুন্দর হয়।

মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে তাকে কথাটা বলেছি—আবার কখনও নিজেদের দিকে তাকিয়ে থমকে থেকে গভীরভাবে চিন্তা করেছি—আমরা তার সঙ্গীরা, বন্ধুরা এত ভাল হতে পারি না কেন। চেষ্টা করেও পারি না। হিংসা বিদ্বেষ রাগ অভিমান কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না।

যাই হোক, শনিবার বিকেলে নানারকম ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে পাখির কিচিরমিচির শুনতে শুনতে আমরা যখন মায়া-কুঞ্জের দিকে এগুচ্ছিলাম—মনে হচ্ছিল কি, ঈশ্বরের দূত হয়ে বাবলা বুঝি আমাদের কোন স্বর্গলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

একটা জিনিস দেখে খুবই অবাক লাগল।

আমাদের দেখে চিরকাল নাক সিঁটকিয়েছে আর ভুরু কুঁচকিয়েছে—কিপটে মানুষ, পিণ্টুর অ্যাডভোকেট জেঠা চমৎকার ফোকলা হাসি হেসে ফটকটা খুলে দিয়ে আমাদের আদর করে ভিতরে ডাকল: এসো এসো বাছারা—তোমাদের অপেক্ষায় সেই বেলা তিনটে থেকে বসে আছি।

জেঠি আমাদের সাড়ে চারটেই টাইম দিয়েছিল, বাবলা বলল।

ঐ আর কি। পিণ্টুর জেঠা আর একবার মাড়ি দেখিয়ে হাসেন। রিটায়ার্ড মানুষ তো, সময় আর কাটতে চায় না। ভাবলাম কতক্ষণে তোমরা আসবে, আর গল্পগুজব করব।

এতকাল আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করার কথা মনে ছিল না। মণ্টু আমার কানে কানে বলল, খচ্চর দি গ্রেট।

ফিসফিসিয়ে তারাপদ বলল, ঐ ছাখ্ বুড়িও কেমন পড়িমরি করে ছুটে আসছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম পিণ্টুর জেঠি, মনে হল যেন সেই বিয়ের আসনের পোকায় খাওয়া, কিছুটা বা রঙ জ্বলে যাওয়া বেনারসীখানা পরে মুখে পাউডার টাউডার মেখে সেজেগুজে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এসো বাবা, এসো! বাবলার হাত ধরল বুড়ি। ভাবলাম, কি জানি যদি না আস, ভারি দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

কেন আসব না, বাবলা দাঁত ছড়িয়ে হাসল। কথা দিয়েছি,— কথা রাখব। এই যে আমার সব বন্ধুর—

আঙুল দিয়ে বাবলা আমাদের দেখিয়ে দিল।

হুঁ হুঁ! মণ্টুর জেঠি ঘাড় কত করল। সঙ্গে সঙ্গে পিণ্টুর জেঠা— সব ক'টিই তো মুখ চেনা—ছোট ছোট ছিল—এখন জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছে এক-একটি। বলে জেঠা জেঠি খুঁটিয়ে নতুন করে আমাদের মুখ দেখল।

আগাছার জঙ্গলে ভরতি বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলাম। একটা গোলাপ কি গন্ধরাজের গাছ চোখে পড়ছিল না বলে আমাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা ছিল।

কিন্তু আমাদের চোখ তখন ব্যস্ত হয়ে অন্যকিছু খুঁজছে। গোলাপের মত ফুটফুটে একটি মুখ।

আছে, আছে। বাবলা চোখের ইসারায় আমাদের আশ্বাস দিল। অস্থির হবার কিছু নেই বন্ধুরা।

কাজেই চুপ করে হাঁটতে লাগলাম। বাবলা জেঠা-জেঠির সঙ্গে আবার কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ভাবলাম কি, ছোট খুকির মতন থুতনি নাচিয়ে আদুরে ঢঙে জেঠি হাসছিল। রোজই তো তোমাদের ফুটবল ম্যাচ খেলা লেগে আছে—খেলার কথা চিন্তা করতে করতে না আমার বাড়ির চায়ের নেমন্তন্নটা ভুলে যাও।

না না না। বাবলা আবার জোরে মাথা ঝাঁকাল। আজ খেলা ছিল না। খেলা থাকলেও আমরা আসতাম। কথা দিয়েছি যখন--

হুঁ হুঁ, আসতেই হবে। গিন্নীর দিকে চোখ নাচিয়ে জেঠা বলল, শিলিগুড়ি থেকে যেমন তোমার ডানাকাটা পরী ঐ ভাইঝিটিকে আমদানী করেছ—না এসে পারে ওরা। মস্ত মস্ত বেটা হয়ে গেছে না এক-একজন। মাঠের ফুটবল আর কদ্দিন ওদের ভুলিয়ে রাখবে।

বাবলা আমাদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে খুক্ করে হাসে। আমাদের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। মেজাজটা অসম্ভব ভাল হয়ে যায় সকলের। বুড়ো হয়ে পিন্টুর জেঠা দারুণ রসিক হয়ে গেছে। ফিসফিসিয়ে স্বপন ও দীপেনের কানে কানে বলি।

আগাছার বাগান পার হয়ে সবাই এক সময় বারান্দায় উঠে গেলাম।

বাবলার কথাই ঠিক। আমাদের অস্থির হবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। আর ঐ যে বাবলার বিশ্বাসে বিশ্বাস রেখে আমরা তার বন্ধুরা এখানে ছুটে এসেছি। যা নিয়ে তারাপদ কাল বলেছিল, ভাল কিছুতে বিশ্বাস করে মরাও ভাল—কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, প্রতি মুহূর্তে আমরা টের পেতে লাগলাম।

আজ আর ম্যাক্সি না। ফ্রক গায়ে। সাদা ফ্রক। এক আঁচড় রং

নেই জামাটার কোথাও। তাই ভীষণ পবিত্র পবিত্র দেখাচ্ছিল ওকে। যেন সাদা এঞ্জেলের পোশাক। বেণী বাঁধেনি। এলো চুল পিঠে ছড়ান। যদিও চুলটা একটু লালের দিকে। মিষ্টি সুন্দর মুখটায় না একটু পাউডারের ছিঁটে, না চোখের ধারে একটু কাজলের ছোপ। অর্থাৎ ইচ্ছে করে সুন্দর হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওর নেই, এক নজর দেখেই বোঝা গেল।

এবং আরও বোঝা গেল সুন্দর হয়ে সেজে থেকে পুরুষের মন কাড়বে—সেই মনই নেই এই মেয়ের। যেমন পপি, ডেইজি, টুবলীরা করত। এখন ওদের ছোট বাবলি মুন্নি ইরানিরা করে। এমন কি বস্তির শান্তা জোনাকিদেরও তাই দেখা গেছে। এখন ওদের ছোট বোন শর্মিষ্ঠা ডালিয়া ওরা বিকেল পড়লে সেজেগুজে থাকে। এর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য। পুরুষের চোখে আমরা সুন্দর থাকব। যদিও শেষ পর্যন্ত কিছু যায় ছাদনাতলায়, কিছু সিনেমা থিয়েটার করে জীবন কাটায় বা এয়ার হোস্টেজ হয়ে আকাশে ওড়ে।

বলতে কি ফ্রক গায়ে, এলো চুলে দারুণ ঘরোয়া ঘরোয়া লাগছিল পিণ্টুর জেঠির ভাইঝি রুবিকে। যেন এতকাল আমরা এমন একজনের অপেক্ষায় ছিলাম। এবার কাছে পেয়ে গেছি। বাবলাকে বিশ্বাস করে আমরা যে ঠকিনি প্রতি মিনিটে তা উপলব্ধি করা যাচ্ছিল।

মাঝের হলঘরে একটা বেশ বড় গোল টেবিলে আমরা ইয়ং-ইলেভ্‌ন্‌এর এগারোজন আর রুবি মোট বারোজন বসে চা খাচ্ছিলাম গল্প করছিলাম।

জেঠি নিজের হাতে সার্ভ করছিল। মুড়ি তেলেভাজা। সঙ্গে একটা করে খৈ-এর নাড়ু আর গরম গরম চা।

কেক্‌, পুডিং, চপ, কাটলেট, রাজভোগ, সিঙ্গাড়া, প্যাস্ট্রী প্যাটিজ, চিকেন, মাটন কিছুই নয়। খুবই সাদাসিধে আয়োজন। ঘরোয়া

খাওয়া। এর মধ্যে কোনো ভাণ নেই ভনিতা ছিল না। যে জন্য আসরটা আরও বেশি জমল। পরিবেশটাই তো ঘরোয়া।

জেঠু পাশে দাঁড়িয়ে দেখাশোনা করছিল। গিন্নী যদি অসাবধানবশতঃ চামচ থেকে এক কণা চিনি বা এক ফোঁটা দুধ টেবিলে ফেলে দিচ্ছিল, অমনি তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে বুড়ো চুকচুক শব্দ করছিল: আহা, লোকসান করবে না মিনু, লোকসান আমি চোখেই দেখতে পারি না। যত খুশি খাক, কিন্তু একটা মুড়ির দানাও যেন অপচয় না হয়।

মিনু, মিনতি, অর্থাৎ পিণ্টুর জেঠি চোখ পাকিয়ে পিণ্টুর জেঠাকে বলছিল, তোমার সবদিন সবরকম সর্দারি আমার পছন্দ হয় না। আজকের এই আনন্দের দিনে এক চামচ চিনি বা এক চামচ দুধ চলকে নীচে পড়বে, কি একমুঠো মুড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেঝেয় গড়াবে তার জন্য এত বুক টাটানি ভাল নয়। বাবলা আর তার বন্ধুরা এসে যে আজ আমার বাড়িটা ভরিয়ে তুলেছে—এই খুশি নিয়ে আমি বাঁচিনে।

হুঁ, তা বটে, আমি অস্বীকার করছি না। এতকাল আমি তুমি দু' বুড়োবুড়ি একটা শ্মশান আলগাচ্ছিলাম। পিণ্টুর জেঠা আমাদের মুখের দিকে চোখ রেখে ফোকলা গালে হাসল। তারপর গিন্নীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে আবার বলল, তোমার ভাইঝি এসে ফুল ফোটাল, আর বাড়িটা এক ঝাঁক মৌমাছির ভন ভনানিতে গরম হয়ে উঠল।

অর্থাৎ চা খেতে খেতে আমরা দারুণ প্রাণখুলে হাসছি, গল্পটল্প করছি—আমাদের কটাক্ষ করে পিণ্টুর কিপটে অ্যাড্‌ভোকেট জেঠা এমন একটা জোরালো রসিকতা করল। শুনে আমরা অখুশি হলাম না। সবচেয়ে খুশি রুবি। যুঁই ফুলের মতন সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে খিল খিল হাসল আর আমাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকাল। এখানেই ওর সৌন্দর্য।

যখনই হাসছে, এগারোটা মুখের দিকে এগারোবার তাকাচ্ছে। যখনই কথা বলছে, এগারোজনের মুখের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নাড়ছে। চুল দোলাচ্ছে।

কোন একটি বিশেষ মুখের দিকে ওর চোখ স্থির হয়ে থাকছে না, বা কেবল একজনের মন ধরে রাখবে তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই।

আমাদের সকলকেই খুশি রাখছিল ও। বাবলার কথাই ঠিক। ইয়াং-ইলেভ্‌ন্‌-এর সকলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে।

তাই রুবিকে নিয়ে আমরা এগারোজনই দুর্দান্ত মেতে উঠলাম।

মৌমাছি বলে ওদের ঠাট্টা করছ। জেঠিও রসিকা কম নয়। চিকন কেটে জেঠাকে সাবধান করছিল। তুমি একটু দূরে দূরে থেকো। হুলটুল ফুটিয়ে দিতে পারে।

আরে না না, আমি তো এই বাগানের মালী। ফুল রক্ষণাবেক্ষণ করব। মৌমাছিরা এসে মধু খাবে। মালীর ওপর মৌমাছিদের রাগ থাকে না।

শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। একবার করে সকলের মুখের দিকে চোখ ঘুরিয়ে রুবি হাসছিল।

দারুণ আমোদের মধ্যে তেলেভাজা মুড়ি ও খৈয়ের নাড়ু দিয়ে চা খাওয়া শেষ হল। দেখছিলাম পিন্টুর জেঠার হল ঘরে পাখা নেই। সম্ভবত শোবার বসবার ঘরেও পাখা ছিল না। পাখা খাটালেই ইলেক্‌ট্রিকের লম্বা বিল আসবে ভয়ে মায়া-কুঞ্জে সেই পাটই রাখা হয়নি।

আমরা প্রচুর ঘামছিলাম। দেখে জেঠি বলল, এসো বাগানে গিয়ে বসা যাক।

জেঠা বলল, হুঁ, বাগানে ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসার আলাদা আনন্দ।

এতক্ষণ পরে একটা খেলার মেজাজ এসে গেল। আমরা কি পিন্টুর জেঠা-জেঠির মতন বুড়ো হয়ে গেছি? ঘাসের ওপর পা

ছড়িয়ে কোমর ভেঙে শরীরটাকে ঢিলেঢালা করে ছেড়ে দিয়ে গল্প করব। ভাবতেই কেমন লাগছিল। বিশেষ করে রোদটা তখন প্রায় মজে গিয়ে মায়া-কুঞ্জের ঝোপঝাড়ে, একদিন যেখানে গুচ্ছের গোলাপ গন্ধরাজ ফুটত, এখন বনতুলসী আর কাঁটানটের জটলার ভিতর একটানা ঝিঁঝির বাজনা আরম্ভ হয়ে গেল। এবং অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলুদ পোড়া রং নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের একটা বেশ বড়সড় চাঁদ বাগানের পিছন দিকের একটা সফেদা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল। রূপালী হলুদ জ্যোৎস্নায় মায়া-কুঞ্জ টলটল করতে লাগল। কী যে ভাল লাগছিল! রুবিকে নিয়ে আমরা ছুটোছুটি করছিলাম। বুঝুন, সতেরো বছরের টাটকা গোলাপের মতন ফ্রক পরা এক মেয়ে। আর ইয়াং-ইলেভ্ন-এর আঠারো উনিশ কুড়ি বছরের আমরা এগারোটি মরদ। কী না করতে পারতাম ওকে নিয়ে আমরা! কিন্তু তেমন কোনো স্বার্থপর ইচ্ছাই আমাদের বুকের মধ্যে উঁকি দিতে পারছিল না। রুবিই তা হতে দিচ্ছিল না। কেননা সকলের কাছেই ধরা দিতে তৈরী হয়ে খেলায় মেতে উঠেছিল ও। বাগানের এই ঝোপের আড়ালে সেই গাছের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে লুকোচুরি খেলছিলাম। আর সেই সুযোগে একবার আমার গা ঘেঁষে, একবার বাবলার বুক ঘেঁষে, কখনো শ্যামলের, কখনো মন্টুর, কখনো দীপেনের, নয়তো তারাপদর পিঠ ঘেঁষে কোমর ঘেঁষে চুপটি করে রুবি দাঁড়িয়ে থাকছিল। থাকতে ও ভালবাসছিল। আর ঐ অবস্থায়, এত নিরিবিলি যেখানে, পোকার শব্দ ঝি ঝি-র ডাক গাছের পাতার সরসর ও প্রায় রূপকথার দেশের মতন হলুদ রূপালী জ্যোৎস্না ছাড়া অন্য কিছু ছিল না—সেখানে দু'জনের হৃৎপিণ্ড দুলে উঠতে পারত, গায়ের রক্ত উছলে উঠতে বাধা ছিল না। কিছুই হল না সেসব। হল না এই কারণে, এখন রুবি আমার বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, পরমুহূর্তে চলে যাচ্ছে দীপেনের কাছে, তারপর চোখের পলক না ফেলতে শ্যামলের কাছে। আবার

শ্যামলকে ছেড়ে তারাপদর কাছে। এই জন্যই লুকোচুরি খেলায় এত আমোদ। রুবি কাউকে বিমুখ করছিল না।

কি। জেঠা-জেঠি তখন সিঁড়ির কাছে ঘাসের ওপর বসে সন্ধ্যেহাওয়া খেতে খেতে—না, বিশ্রম্ভালাপ বলব কেন, সেই বয়স দু'জনের ছিল না। নিশ্চয় চা চিনি দুধের হিসাব—একটা বিকেলের মধ্যে কি পরিমাণ খরচ হল, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। সাপখোপের ভয়ে ঝোপঝাড়ের দিকে পা বাড়াত না জানা কথা। যেটা আমরা অতি সহজেই পারছিলাম। তা ছাড়া আমাদের আকর্ষণ ছিল রুবি। ফণিমনসা বনতুলসী আর কাঁটানটের ঝোপের ভিতর, বা ওদিকে সফেদা আতা জামরুল লেবু পেয়ারা ও ডালিম গাছের পছন্দসই আড়াল খুঁজে খুঁজে লুকোচুরি ছাড়া আমরা আর কী-ই বা খেলতাম, কিপটে অ্যাড্ভোকেট ও অ্যাড্ভোকেট-গিন্নী বেশ বুঝতে পারছিল। ক্রিকেট ফুটবলের জায়গা নেই জঙ্গলে। তা ছাড়া আমাদের নিয়ে দু'জনের চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। সারা বাড়ি জুড়ে একটা ফুল নেই, ফুলের গাছ নেই যে ছেলেবেলার মতন ফুল ছিঁড়ে ফুলের গাছ উপড়ে ফেলে আমরা বাগান তছনছ করতাম। আতা সফেদা ডালিম নিয়ে যে-কটা ফলের গাছ তখনও দাঁড়িয়ে, সেসব আমরা নষ্ট করব না বুড়ো-বুড়ি বুঝে নিয়েছিল। যেহেতু লুকোচুরি খেলার জন্য গাছগুলি আমাদের ভীষণ আড়াল দিচ্ছিল। তা ছাড়া বড় হয়েছি। গর্ভবতী নারীর মতন এই সব ফলের গাছটাছকে এখন নারীজ্ঞান করে আমরা প্রীতির চোখে দেখব—পিণ্টুর জেঠা-জেঠির মনে এমন একটা আশাও ছিল।

সুতরাং আর কি নিয়ে দুশ্চিন্তা।

রুবি?

সেই কথাই তো হচ্ছে—সেই গল্পই করছি এতক্ষণ।

আমার গালে গাল ঠেকিয়ে বাবলার বুকে বুক ঠেকিয়ে মণ্টুর কোমরের সঙ্গে কোমর ছুঁইয়ে শ্যামলের কাঁধে কাঁধ রেখে সবাইকে

অদ্ভুত জ্যোৎস্নার রাতে রুবি অস্থির করে তুলল, অথচ কোথাও এক সেকেণ্ডের বেশি স্থির হয়ে থাকছিল না ও। নিশ্চয় পিণ্টুর জেঠি তা জানত। ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে দুধ চা ও চিনির হিসাব করতে করতে জেঠাকেও নিশ্চয় তাই বোঝাচ্ছিল। কাউকে আঁকড়ে থেকে হাবুডুবু খাবে, তারপর মরবে, সেই দুর্বুদ্ধি নিয়ে রুবি জলপাই-গুড়ি থেকে এখানে আসেনি। তা হলে গুচ্ছের চেঙ্গা চেঙ্গা ছেলেকে জেঠি বাড়িতে ডাকত না আর তাদের সঙ্গে ভাইঝিকে ঝোপের ভিতর খেলাধুলা করতে দিত না।

আমরা মনে মনে প্রশংসা করছিলাম বাবলার চোখের, তার দৃষ্টি-শক্তির। আর যদি সেটা কল্পনা বা স্বপ্ন হয়ে থাকে—তাও কত সত্যি।

মুহূর্তে মুহূর্তে বুঝতে পারছিলাম রুবির খেলার সৌন্দর্যটা কোথায়। ইচ্ছে করে এমন একটা লুকোচুরি খেলা ও বেছে নিয়েছিল।

সবাইকে সুখ দেবে। কেবল একজনকে সুখী করার নামে তাকে পাগলা-গারদে পাঠান, কি তাকে দিয়ে বিষ গেলান, কি শেষ পর্যন্ত কোনো বাবার আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া—তেমন খেলা রুবির জানা নেই।

এতটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল বলে বাবলা আমাদের এখানে নিয়ে আসে।

জ্যোৎস্নার রং ফিরছিল। হলদে ভাবটা কেটে গিয়ে রূপোটাই বেশি চকচক করছিল। পাখিরা অনেকক্ষণ কুলায় ফিরে একঘুমের পর জেগে উঠে এক-পহর নিশির জানান দিতে একটু কু-কা ডেকে তখনি আবার থেমে গেছে। তখন গাছের পাতার সরসর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

জানি না, বারান্দার সিঁড়ির সামনে ঘাসের বিছানায় রাত্রের ঝিরঝির মিষ্টি হাওয়াটা বুড়ো বুড়িকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল কিনা।

আমাদের একটানা খেলা চলছিল।

নিজের ভাইঝিকেও ঘরে ডাকছিল না জেঠি—আমাদেরও বাড়ি ফিরে যেতে তাড়া দিচ্ছিল না পিন্টুর জেঠা।

অবাধ স্বাধীনতা।

কোন একটা ঝোপের আড়াল থেকে রুবির কুলকুল হাসি কানে আসছিল। যেন দোলনায় চেপেছে। সেইরকম বাতাসের বাড়ি খাওয়া ঢেউ খেলান হাসি।

কার কাছে এখন ও? স্বপনের কাছে। তারাপদর কাছে। মণ্টু না কি বাবলার কাছে। শ্যামল? দীপেন? অরুণাভ? মৃণাল? কিংশুক? মিহির! ইয়াং-ইলেভ্ন্-এর কোন্ ভাগ্যবান পুরুষের বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এমন আহ্লাদের হাসি হাসছে মেয়ে কল্পনা করতে লাগলাম। যার কাছেই থাকুক—একটু বেশি সময় যে সে সেখানে থেকে যাচ্ছে, সন্দেহ রইল না।

একটা ঈর্ষার কাঁটা বুকের মধ্যে অনুভব করলাম।

এই প্রথম ঈর্ষার জ্বালা নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। স্বাভাবিক। মনে হচ্ছিল আমার কাছে আর একটু বেশি সময় থাকলে দোষ ছিল কি।

আমি জোর করিনি?

নিশ্চয় যে জোর করছে, হাত ধরে টেনে রাখছে, তার কাছে বেশিক্ষণ থাকছে ও।

এই কি মেয়েদের স্বভাব! জোর করতে হয়? প্রথমটা আপত্তি করবে। বুনো হাঁসের মতন ডানা ঝাপটাবে। পালাতে চাইবে। তারপর হার মানবে। পোষ মানবে। তখন কুলকুল হাসি!

কান দুটো গরম হয়ে উঠল।

আমার মতন আর কে কে ওকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেনি, চেষ্টা না করে এখন আফশোষ করছে, আর বুকের ভিতর ঈর্ষার খোঁচা খেয়ে ছটফট করছে, ভাবতে লাগলাম।

এটা কিন্তু খেলার নিয়ম নয়।

জোর করে কাউকে তুমি ধরে রাখতে পার না। আবার কেউ যদি তোমাকে জোর করে—ঝোপের আড়াল থেকে এমন শব্দ করে তুমি হাসতে পার না। তবে আর লুকোচুরি খেলা কী! লোকে টের পেয়ে যায়।

নিয়মটা কে ভাঙ্গতে পারে চিন্তা করে তার মুখটা মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করি। শ্যামল—স্বপন—দীপেন—মণ্টু—বাবলা?

না না। বাবলা কক্ষনো নিয়ম ভাঙ্গবে না। খেলার ক্যাপ্টেন সে। এই নতুন খেলায় গরজ করে বন্ধুদের সে টেনে এনেছে এখানে।

বরং, ভেবে হঠাৎ অবাক লাগছিল, বাবলা কেন নিয়ম ভাঙ্গতে দিচ্ছে। করছে কি সে? কোনো গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে!

মনে মনে বাবলাকে ডাকলাম।

যদিও মনে মনে ডাকবার কিছু অর্থ নেই—চিন্তা করে ঝোপঝাড়, অন্ধকার, জ্যোৎস্না ও গাছের পাতা দু'হাতে সরিয়ে এক পা দু পা করে এগোই।

পায়ে কাঁটা বিঁধছিল।

মশার কামড় টের পাওয়া গেল।

বুঝলাম এটাই নিয়ম। যখন মনের মধ্যে আনন্দ থাকে না, প্রেম থাকে না, উদারতা থাকে না তখন মশা মাছির কামড় পোকামাকড়ের উপদ্রব কাঁটার আঁচড় ইত্যাদি গায়ে বেশি লাগে। এতক্ষণ এসব কিছুই টের পাইনি। জিনিসগুলি ছিল। কিন্তু প্রাণে

আনন্দ থাকার দরুণ, মন অন্যদিকে ব্যস্ত থাকার দরুণ মশা মাছি কাঁটার খোঁচা ভুলে গিয়েছিলাম।

কে ?

শ্যামল।

শ্যামল আতাঝোপের আড়ালে একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। দেখে ভাল লাগল। আমার মতন অসহায় দেখাচ্ছে তোকে। বললাম।

কুলকুল করে হাসছে ও। শ্যামল বলল।

হুঁ, হাসছে। কোথায় হাসছে জানিস ?

বলতে পারব না। খুঁজতে হবে।

আয়, দু'জন ঝোপঝাড় ঠেলে এগোই।

কে ?

আমি।

মণ্টুকে পেয়ে গেলাম। মনমরা হয়ে একা ডালিমের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে।

হাসি শুনছিস ?

খুব।

কোথায় ?

বলতে পারব না। খুঁজে দেখতে হবে।

মণ্টু ও শ্যামলের মতন অন্ধকারে আর এক জায়গায় মিহিরকে পাওয়া যায়। আর এক জায়গায় স্বপনকে। তারপর তারাপদকে। এই তো দীপেন জামরুল গাছের গুঁড়ির কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম সব।

সবাই যে যার জায়গায় মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে, অথচ একটা খুশির হাসি শোনা যাচ্ছে। দোলনায় দোলা খেয়ে খেয়ে হাসলে যেমন শোনায়। ব্যাপার কি! বাবলা কোথায়! বাবলাকে খুঁজে বার করতে হয়।

এই তো আমি।

এক চোখে গোছা গোছা লিচুপাতার ছায়া, আর এক চোখে চকচকে জ্যোৎস্না নিয়ে বাবলা দাঁড়িয়ে। একা। যেন বুদ্ধিহারা একটা মানুষ।

হাসি শুনছিস?

শুনছি।

কোথায় দাঁড়িয়ে হাসছে? কার সঙ্গে হাসছে? দশটা গলায় ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করলাম। দেখতে পাচ্ছিস, ইয়ং-ইলেভ্‌ন্‌-এর এগারোজন আমরা এখানে। তাহলে?

তাহলে···বাবলা বিব্রত হয়ে এদিকে চোখ ফেরাল, ওদিকে তাকাল।

চাঁদের আলোর জন্য পরিষ্কার বোঝা যায়, তার কপালের শিরা ফুলে উঠেছে ঈর্ষার খোঁচা।

কিন্তু তক্ষুণি ঈশ্বরের দূত নির্বিকার হয়ে গেল। দেখলাম বাবলার মুখে হাসি ফুটেছে।

হাসছিস যে বড়! রুবি কোথায়? উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমরা।

আস্তে! বাবলা হাত তুলল। যেন অস্থির ক'টি শিশু আমরা। আমাদের শান্ত হতে বলছে সে।

আস্তে কেন! আমরা গর্জন করে উঠলাম। কুলকুল করে হাসছে ও শুনছিস না!

হুঁ, শুনছি।

কেন হাসছে, এত সুখ কিসের!

এক সেকেণ্ড বাবলা ভাবল, তারপর বলল, মনে হয় আমাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে খেলাটা শেষ করতে পেরেছে বলে।

কি বলছিস তুই! এক সঙ্গে আমাদের দশটা গলা হাউ হাউ করে উঠল। তোর কথাবার্তা হেঁয়ালীর মতন ঠেকছে। এখনি খেলা শেষ করে ফেলল! বাবলা চুপ করে থাকে।

ওকে খুঁজে বার কর। আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

বাবলা হাঁটে। আমরা হাঁটি।

এদিক ওদিক তাকায় সে।

উঁহু, ঝোপঝাড়ের মধ্যে আর নেই। আমরা বললাম, তাহলে এতক্ষণে কোথাও দেখতে পেতাম।

কিন্তু হাসিটা এখনো শোনা যাচ্ছে। বাবলা বলল।

তাইতো বলছি, সমস্বরেই গর্জন করে উঠলাম সব। খেলা শেষ হয়েছে। এখনও হাসছে। এর অর্থ কি! কার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বাবলা মাথা নিচু করে পা ফেলে হাঁটে। আগাছার বাগান পিছনে রেখে আমাদের নিয়ে বারান্দার সিঁড়ির কাছে চলে আসে।

আমাদের চক্ষু স্থির।

ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বুড়ো বুড়ি বসে। দুজনের পায়ের কাছে টলটলে জ্যোৎস্না।

জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে ফ্রক পরা রুবি। মনে হল একটা শ্বেতপাথরের ফুল কুলকুল হাসছে। পাথরের ফুল এমন করে হাসে আমাদের জানা ছিল না।

ঐ ছাখ্! বাবলা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

হুঁ, তা দেখছি। মণ্টু বলল, কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। পিণ্টুর জেঠা-জেঠির সামনে এই জোছনার রাতে ওকে মানায় না।

এখানে ওকে ডাক। স্বপন বলল, তারপর ঝোপের আড়ালে নিয়ে চল।

তা কি হয়। বাবলা মাথা ঝাঁকাল। খেলা শেষ করে দিয়েছে ও।

খেলা শেষ করে দিয়ে বাড়ীর লোকের কাছে ফিরে এসে হাসছে, এর অর্থ কি। তারাপদ আমার দিকে তাকায়।

আমি মিটিমিটি হাসি। বাবলাকে দেখি।

বাবলা কটমট করে তারাপদকে দেখে।

দীপেন মাথা ঝাঁকায়। দাঁতে দাঁত ঘষে বাবলাকে দেখে। শ্যামল হিসহিস শব্দ করে। এই বাবলা। বাবলাকে ডাকে সে। বাবলা শ্যামলের দিকে চোখ ঘোরায় না। শ্যামল বলে, খেলা শেষ করে আমাদের ছেড়ে এসে, ওর ওই, কি বলে যেন হুঁ, পিসা-পিসির সামনে দাঁড়িয়ে কুলকুল হাসছে। এই হাসির অর্থ কি বলতে পারিস?

তা কি করে বলবে। বাবলা যে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। মিহির টিপ্পনি কাটল। এই হাসির অর্থ তার মাথায় ঢুকবে না।

না, ঢুকবে না। তারাপদ গজগজ করে উঠল। এই জন্যেই তো ওর মাথায় একটা চাটি মেরে অর্থটা বুঝিয়ে দিতে হয়। খেলা সেরে এসে এখন ওই মেয়ে বুক উজাড করে দিয়ে পিসা-পিসির সামনে হাসছে। এই হাসি আমরা মোটেই সহ্য করতে পারছি না।

বুঝলি? বাবলার মুখের কাছে ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে স্বপন চাপা গলায় বলল, আমাদের এগারোটা ছেলের সঙ্গে ঝোপের ভেতর লুকোচুরি খেলে এসে শিলিগুড়ির না জলপাইগুড়ির ওই রুবি হেসে কুটিকুটি—এর একটাই শুধু অর্থ দাঁড়ায়।

কি অর্থ শুনি? কোমরে হাত রেখে মুখ কালো করে বাবলা স্বপনকে দেখল।

অরুণাভ বলল, তোর মাথায় কিচ্ছু নেই বাবলা।

কি করে থাকবে। মণ্টু নাক সিঁটকায়, মুখ বেঁকায়। সারা-জীবন ক্রিকেট ফুটবলের ক্যাপ্টেনগিরি করে এসেছে। জ্যোৎস্না

ও অন্ধকার মাথায় করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে এতগুলো ছেলেকে নিয়ে একা একটা মেয়ে কেমন খেলা খেলল, যদি তার ধারণা থাকত, এখানে আমাদের ডেকে আনত না ওই অজবুক।

গালাগাল করবি না মণ্টু। বাবলা ঠাণ্ডা গলায় বলল।

একশ' বার গালাগাল করব। তারাপদ চোখ রাঙাল। তুই গালিগালাজ খাবার মানুষ।

দেখছি তোদের মাথা গরম হয়ে গেছে। বাবলা না বলে পারল না।

নিশ্চয় গরম হবে। স্বপন বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখার খেলায় তুই কিন্তু আমাদের এখানে ডেকে আনিসনি রাস্কেল।

আস্তে! চেঁচামেচি করলে বুড়ো-বুড়ি টের পেয়ে যাবে আর এখুনি ছুটে আসবে। বাবলা একটা গরম নিঃশ্বাস ফেলল।

আসুক। তারাপদ বলল, বুড়ো-বুড়িকে আমরা খুব একটা গ্রাহ্য করছি কিনা—তুই ওই মেয়েকে ডাক।

কেন ডাকব! বাবলা মুখ ঘুরিয়ে গেটের দিকে এগোয়।

এই ইডিয়েট! শ্যামল ধমক লাগল। কোথায় চললি।

চলে যাচ্ছি, খেলা শেষ হয়ে গেছে।

না, শেষ হয়নি, ওকে নিয়ে আমরা আবার পিণ্টুর জেঠার আগাছার জঙ্গলে ঢুকব মণ্টু চেঁচিয়ে বলল।

এই খেলা সেই খেলা নয়। বাবলা ঘাড় না ঘুরিয়ে উত্তর করল। তারপর জোরে পা চালাল।

গেট্ পার হয়ে রাস্তায় নামল। আমরা তার পিছনে ছুটলাম।

এই বাবলা! পিছন থেকে ডাকি।

আমাদের ডাকে সে সাড়া দেয় না।

আমার মনে হচ্ছে কি! মণ্টু বলল, পিণ্টুর জেঠির ভাইঝি নিজে এক ফোঁটা খেলেনি। আমাদের এতগুলো ছেলেকে এতক্ষণ খেলিয়েছে।

তাইতো। তারাপদ ঘাড় নাড়ল। তাই পিসা-পিসির কাছে ফিরে গিয়ে ছুঁড়ি মজা করে হাসছিল।

আমরা ওর একটা চুল এদিক থেকে ওদিকে সরাতে পারলাম না। শ্যামল গজরাতে লাগল।

তাইতো। স্বপন ঠোঁট কামড়ালে, ওর একটা পাপড়ি আমরা খসাতে পারিনি। সাদা ফ্রক পরে যেমন ফুলটি হয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিল—তেমনি আস্ত ফুল হয়ে ফিরে গিয়ে বুড়ো বুড়ির সামনে হাসছিল।

এটা ওর জয়ের হাসি, বুঝলি,--আমি বললাম, আমরা দশটা ছেলে—এগারোটা ছেলে ওর কিছুং করতে পারলাম না, আমরা হেরে গেছি—আমাদের হারিয়ে ও কুলকুল করে হাসছিল।

এইজন্য বাবলা দায়ী। তারাপদ দাঁতে দাঁত ঘষল। বলছিল পবিত্র খেলা।

শুয়োরটাকে ধর, ধরে ওই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মাথাটা ঠুকে দে!

আমরা দ্বিগুণ বেগে ছুটছিলাম। ছুটে গিয়ে বাবলাকে ধরে ফেললাম।

বাবলা থরথর করে কাঁপছিল। চাঁদের আলোয় মুখটা কাগজের মতন সাদা দেখাচ্ছিল।

ওকে নিয়ে আয়! বাবলার হাত ধরে তারাপদ জোরে ঝাঁকুনি দিল। পিন্টুর জেঠির ভাইঝিকে আমাদের দরকার।

না না! ভয় পাওয়া গোল গোল দুটো চোখ নিয়ে বাবলা মাথা নাড়ল। তোরা যা ভাবছিস তা নয়—রুবি সেই ধরণের মেয়ে নয়।

আলবৎ সেই ধরণের মেয়ে! স্বপন দাঁত খিঁচোল। ওকে এখানে ডেকে না আনলে তোকে আমরা মেরেই ফেলব। বলতে বলতে স্বপন বাবলার মাথাটা রাস্তার ধারের গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেসে ধরল।

সব মেয়ে এক ধরণের। শ্যামল ভেংচি কাটল। ওকে নিয়ে আয় ও আমাদের দারুণ ঠকিয়েছে।

তাইতো! মন্টু চিৎকার করে উঠল। আধঘণ্টা ধরে আমাদের এগারোটা জোয়ান ছেলেকে কেমন খেলিয়ে তারপর ছেড়ে দিয়েছে এক রত্তি মেয়ে। ভবিষ্যতে কুড়িটা ছেলেকে একসঙ্গে খেলাবে, আর কুড়িটা পুরুষের মাথা একসঙ্গে নষ্ট করবে।

তারপর পিসা-পিসির কাছে গিয়ে হাসবে, আমি বললাম।

এই বাবলা! মন্টু হাত বাড়িয়ে বাবলার মাথাটা গাছের গায়ে ঠুকে দেয়।

বাবলা আর কথা বলছিল না। যেন তার শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। যেন সে বুঝে গেছে আমরা কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছি। পশু হয়ে গেছি। তার কপাল কেটে রক্ত ঝরছিল।

আর না, এখন ছেড়ে দে! আমার হঠাৎ কেমন কষ্ট হচ্ছিল। মন্টুদের অনুনয় করলাম।

অবশ্য আমি বলার আগেই ওরা বাবলাকে ছেড়ে দিত ঠিক। উল্টো দিক থেকে একটা জীপ গাড়ি ছুটে আসছিল। পুলিশের গাড়ি সন্দেহ করে মন্টু, তারাপদ এবং বাকি সব যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

একলা আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবলা রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর বসে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

এই বাবলা! আমি ডাকলাম।

হাত থেকে মুখ সরায় বাবলা। রক্তে ও জ্যোৎস্নার বীভৎস দেখায় চেহারাটা। সেই সঙ্গে চোখের জল।

বুঝেছিস! আমার মুখের দিকে তাকায় বাবলা। ওরা যে এত ক্রুয়েল হবে—এমন সাংঘাতিক হবে আমি জানতাম না আমি সকলের ভাগ করেছিলাম। সবাই মিলে আনন্দ করতে ওখানে গিয়েছিলাম।

ওরা বুঝতে পারেনি, আমি বললাম। আমিও তখন বুঝিনি। আমার গলার স্বরে অনুতাপ জাগল। বাবলার চোখে চোখ রাখতে লজ্জা করছিল।

আমাদেব রক্তের মধ্যে সাপ আছে যেন নিজের মনে বাবলা বলল, পপি, ডেইজি, টুবলি বা রুবিরা এর জন্য আর কতটা দায়ী। মেয়ের গন্ধ পেলেই আমরা কেউ পাগল হই, কেউ সুইসাইড করি, বিবাগী হয়ে আশ্রমে ছুটি, নয়তো কাউকে খুন করি। আমাকে ওরা খুন করত সোমেন।

না না! আমি ছিলাম না? বাবলার মাথায় হাত রেখে সন্ত্বনা দেই। আমি তোকে বাঁচাতাম।

বাবলা চুপ করে রইল।

দূরে একটা গাছের মাথায় অনেক টুনি বাতি জ্বলছিল। মাইক বাজছিল। যেন বস্তির কোন একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর গাছের পাতা সরসর শব্দ করছিল।

# নতুন জ্যোৎস্না

আজ সকালবেলা দু'চারজন বন্ধু এসেছিল। সময়টা ভালই কাটছিল।

পুরোনো মুখ, পরিচিত আলাপ সালাপ। কেমন আছিস। ছেলে কি করে? তোর শরীরটা এখন কেমন। এদিকে চেক করিয়েছিলি? আমি বিশেষ ভাল নেই—আমিও নানা ঝনঝাটের মধ্যে আছি রে—নিজের হাই-প্রেসার, কোনদিন পটল তুলব, মেয়েটারও একটা দিক করতে পারছি না। আমিও ঐ আরথ্রাইটেসেই শেষ হব ব্রাদার, তার ওপর ছেলেটা এবার পরীক্ষায় ফেল্ করল। অতুল সোমনাথ ও প্রকাশ। হরিহরের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজেদের কথাও তারা কম বলেনি।

হুঁ, তিনজন এসেছিল। অতুল সোমনাথ ও প্রকাশ যখন চলে যায় তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা। তাদের কারোরই অফিস কাছারি ছিল না। পনেরো আগস্টের ছুটি। স্বাধীনতা দিবসে হৈ হৈ করে তিন বন্ধু একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তাদের নিউ ব্যারাকপুরের বন্ধু হরিহরকে দেখতে এসেছিল। সকাল আটটার মধ্যেই তারা এসে পড়েছিল। তারপর টানা তিন ঘণ্টা সাড়ে তিনঘণ্টা এটা ওটা নিয়ে কথা।

'হরিহর মৃত্যু শয্যায়,' ধরণের খবর পেয়েছিল কি তারা। যে তিনজনই এমন চমৎকার ছুটির দিনটায় কোথাও একত্র হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে এসেছিল?

তিন বন্ধুকে এক সঙ্গে নিমগাছটার নিচে গাড়ি থেকে নামতে দেখে হরিহরের যে কী হাসি পেয়েছিল। আলাদা আলাদাভাবে যদি তারা আসত এ ধরণের প্রশ্ন তার মনে উঁকি দিত না।

যাই হোক, তিনজনকে দেখেই খবর কাগজখানা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে হরিহর বারান্দা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে গাড়ির কাছে ছুটে যায় ও দু'হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে শব্দ করে হাসতে আরম্ভ করে: আমি মরিনি মরিনি, এই ছ্যাখ্ সশরীরে বেঁচে আছি।

হরিহরের কথা শুনে বন্ধুরা ঠোঁট টিপে হাসে ও পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

না, হরিহর মরণাপন্ন এ কথা তারা শোনেনি, ঈশ্বর যেন কোনোদিন এমন অলুক্ষণে কথা তাদের না শোনান। তারা, হরিহরের বন্ধুরা এসেছে তাকে কেবল এটাই জানাতে যে, সংসারে হরিহর একলা দুঃখে নেই, সকলেরই একটা না একটা, কারো বা দুটো তিনটে করে দুঃখ আছে। সুতরাং—

শুনে হরিহর সান্ত্বনা পেয়েছিল বৈকি। অতুলের প্রেসারেব ভাব গতিক ভাল নয়, তার ওপর মেয়ের বিয়ের সুবিধে করতে পারছে না, সোমনাথ আরথ্রাইটেসে দিন দিনই কাবু হয়ে যাচ্ছে, ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল করল—প্রকাশও যেন তার একটা দুটো কি দুঃখের কথা বলল। হ্যাঁ, অফিস থেকে লোন করার কথা ছিল, সেটা আজও স্যাংশন হয়নি, যে জন্য সাঁতরাগাছির জমিতে বাড়ি করে কলকাতার বাস গুটাতে হয়েছে তার উপর তার স্ত্রী আজ ন মাস একরকম শয্যাশায়ী। একটা বিচ্ছিরি ব্যথা তলপেটে। কোনদিন না ডাক্তাররা ক্যান্সার ফেন্সার বলে বসে।

কাজেই হরিহর তুমি ধৈর্য ধর।

দুঃখ পেতেই জীবের জন্ম।

হরিহরের খুব ভাল লেগেছিল আকাশটা। অনেকদিন পর নিজের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাইরের জগতটাকে সে দেখতে পেয়েছিল।

তা ছাড়া ঝকমকে একটা রোদ ছিল সকাল থেকে। ক'দিন একটানা যা বাদলা গেল না!

প্রকাশ সোমনাথ ও অতুলকে দুপুরে এখানে থেকে স্নানাহারটা সেরে যেতে বলেছিল হরিহর। বন্ধুরা রাজী হয়নি। আচ্ছা সে একদিন দেখা যাবে, আবার একটা ছুটিছাটায় তিনজন এক সঙ্গে চলে আসব, সেদিন যেন তাতেই হরিহর সন্তুষ্ট হয়। হেসে ঘাড়টা কাত করে। এটাও তাকে অনেকটা সান্ত্বনা দেবার মতন। যেন বন্ধুরা জেনে গেছে এ ধরণের কিছু কিছু সান্ত্বনা হরিহরের এখন বিশেষ প্রয়োজন।

প্রস্তাবটা তোলা মাত্র তিনজনই যদি দুপুরে এখানে থেকে গিয়ে দক্ষিণ হস্তর কাজটা সেরে ফেলতে সম্মত হত তো হরিহরকে কী মুস্কিলে না পড়তে হত!

একমাত্র চাউল ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। তা না হয় কাউকে পাঠিয়ে মোড়ের মুদী দোকান থেকে ডিম আলু আনিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। ঠিক এই সময়টায় বাজারে গিয়ে মাছ তরকারী পাওয়া যেত কি। পাওয়া গেলেও দু মাইলের পথ স্টেশন বাজারে কাকেই বা পাঠাত সে এ-সময়।

না হয় যেমন করে হোক তারও একটা ব্যবস্থা করত সে। কিন্তু রান্না!

জলের মতন যেটা পরিষ্কার। হরিহর নিজেরটা নিজে রেঁধে খায়। ছেলেকে দিয়ে আজ দুবছরের মধ্যে এক বেলাও উনুনের কাজটি করান গেল না। পাবে, কিন্তু করবে না, তার সময় নেই। মেয়েছেলের মতন পিঠ কুঁজো করে রান্নাঘরে বসে সময় নষ্ট করার মতন সময় তার হবে না।

এই অবস্থায় চার পাঁচটা মানুষের ভারি রান্না হরিহর কী করে সামলাত।

কাজেই পাশের ঘরের উমার মাকে ডাকতে হত। হরিহর যখন একেবারে বিছানা নেয়, তখন উমার মাকে ডাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

কিন্তু আজ হরিহর এই জিনিসটা একেবারে চাইছিল না। উমার মা হরিহরের রান্নাঘরে ঢুকে এটা ওটা করবে, তিনবার ডালটা চালটা ধুতে কুয়োতলায় যাবে, কয়লা ভাঙবে, উনুন ধরাবে। বন্ধুদের নিয়ে এ ঘরে বসলেও ওদিকের দরজা দিয়ে উঠোনটা কুয়োতলাটা এমন কি রান্নাঘরের ভিতরটাও পরিষ্কার দেখা যায়। তখন বন্ধুদের কেউ না কেউ, কেউ না কেউ কেন, তিনজনই হরিহরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করত। রান্নার লোক রাখলে নাকি হরিহর, মহিলা কোথায় থাকেন? মনে হয় মানুষটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভদ্রঘরের মেয়েছেলে বুঝি?

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভদ্রঘরের বলতে হরিহরের বন্ধুরা যে বিশেষ করে উমার মার উজ্জ্বল গায়ের রং ও সুশ্রী স্বাস্থ্যের দিকটারই ইঙ্গিত করত তাতে আর সন্দেহ ছিল কি।

তারপর খেতে বসেও উমার মার হাতের রান্না নিয়ে পাঁচ সাত রকমের কথা বলত না কি তারা; হয়তো বেশীর ভাগই প্রশংসার দিকে যেত—হরিহর এই জিনিসগুলি চাইছিল না।

তারা এসেছিল। অনেকক্ষণ ছিল। হরিহর খেতে বলেছিল। তারা খেল না। শুধু চা বিস্কুট খেয়ে চলে গেল এবং যাবার সময় বলে গেল আর একদিন আসবে।

ব্যস, এই পর্যন্ত। যে জন্য আজ পনেরোই আগষ্ট ছুটির দিন উপলক্ষে, বাড়ীতে বন্ধু সমাগমটা সকালের রোদাল শুকনো খটখটে চেহারার মতন প্রীতিপ্রদ লাগছিল হরিহরের কাছে।

এতটা সময় পুরোনো মানুষগুলির সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বলে শরীবের দিক থেকেও সে বেশ ঝরঝরে বোধ করছিল।

তবু ভাল বাড়ি থেকে বেরোবার আগে পুলক যে পরাশরের দোকান থেকে বিস্কুটটা এনে দিয়েছিল। এই নিয়েও ছেলে গাঁইগুঁই করতে পারত; হরিহর কেরোসিন স্টোভ ধরিয়ে যখন চায়ের কেটলি চাপায় তখন তিন বন্ধু ভয়ানক রকম নীরব হয়ে যায়। তখন

কিন্তু তাদের চিন্তার সঙ্গে হরিহরের চিন্তার মোটেই মিল ছিল না। অন্তত হরিহর তাই মনে করে—কেবল মনে করা না, এই সম্পর্কে সে প্রায় নিশ্চিত ছিল। তারা, হরিহরের বন্ধুরা, হরিহরের অসময়োচিত স্ত্রী-বিয়োগের কথাটা ভেবে ঐ সময়টায় খুবই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাদের কেবল এক বড় বড় নিশ্বাস ফেলার শব্দ তাই বলছিল।

অথচ হরিহর অন্য কথা ভাবছিল। পাশের ঘরের উমার মাকে একবার ডাকা যেতে পারে কিনা, চারপাঁচ কাপ চায়ের জল ফোটান, কাপগুলি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে চা ঢালা, আন্দাজ মতন দুধ চিনি মেশান, তারপর ডিসে করে বিস্কুট সাজিয়ে দেওয়া—উমার মা যেমন নিপুণভাবে কাজটা শেষ করতে পারত, হরিহর তা পারে কখনও—কিন্তু শুধু চায়ের জন্য তাকে হঠাৎ ডাকা।

হরিহর বিবৃত্ত থাকে। নিজের হাতেই জল ফুটিয়ে চা মিশিয়ে আন্দাজ করে দুধ চিনি দিয়ে টেনেটুনে বন্ধুদের সামনে কাপগুলি বাড়িয়ে দেয়, সঙ্গে বিস্কুট দেয়।

হুঁ, এতটা সময় চুপচাপ থাকার পর চায়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করে অতুল, সোমনাথ ও প্রকাশের আবার স্বাভাবিক গলায় কথাবার্তা শুরু হয়।

হরিহরও হালকা বোধ করে।

না, চা খাওয়ার সময় তারা একবারও হরিহরকে সে নিজের হাতেই রেঁধে বেড়ে খাচ্ছে কিনা বা এই জন্য কোন লোক-টোক রাখা হয়েছে কিনা বা যদি না রেখে থাকে, ছেলে তাকে এসব কাজে একটু আধটু সাহায্য করছে কিনা ইত্যাদি একটাও প্রশ্ন করেনি। এই জন্য হরিহর ভিতরে ভিতরে খুসি হয়েছে।

তাই তো, বন্ধুরা চলে যাবার পর উনুন ধরাতে বসে হরিহর চিন্তা করেছে, সংসারটা জটিলতায় ভরা। কে কার জীবনের গভীরে কতটা ডুব দিতে পারে, দিয়ে লাভও বিশেষ কিছু হয় না। আমি

তোমার উপকার করব, তোমাকে সাহায্য করব বললেই যে সত্যিকরে তোমার জন্য কিছু করতে পারব আজকের যুগে হলপ করে কেউ এ কথা বলতে পারে না।

কাজেই মুখের সহানুভূতি, বাইরের সমবেদনা সান্ত্বনাটাই এখনকার দিনে বড়। এই জিনিস দিয়ে তৃপ্তি, লাভ করেও তৃপ্তি। এর অতিরিক্ত তুমি কিছু দিতে যেও না এবং আর একজনের কাছ থেকেও এর অতিরিক্ত তুমি কিছু পেতে আশা করো না। আশা করলেই তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

অনেকটা খাল কেটে ঘরে কুমীর আনার মতন। যেচে কে দুঃখ আনতে যায়। তুমি কেমন আছ, ভাল আছি, তুমি ভাল নেই? আমিও ভাই ভাল নেই—ব্যস তারপর যে যার রাস্তা দেখ। বেশি উঁকি দিতে গেলে তুমি ঠকবে, আমারও বিড়ম্বনার শেষ থাকবে না।

হরিহর জানত, যেমন দুরবস্থার মধ্যে আছে সে, অতুল সোমনাথ বা প্রকাশকে হাজারবার বলেও এখানে মধ্যাহ্ন আহারে রাজী করানো যেত না। আর একদিন আমরা আসব, আর একদিন আমরা এখানে খাব—একটা কথার কথা। তবু একবার বন্ধুদের মুখের আদর করা এবং আদরের উত্তরে বন্ধুদেরও ঐ রকম একটা কিছু বলে হরিহরের বাড়ী থেকে বিদায় নেওয়া। এটাই এদিনে সুন্দর। সহজও।

উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে হরিহর পুকুরের দিকে চলল।

বাড়ির কুয়োতলায় স্নান করা সম্ভব না। একলা হরিহরের বাড়ি নয় এটা। আরও দু-ঘর ভাড়াটে আছে।

কাজেই এ সময় কুয়োতলা ফাঁকা পাওয়া কঠিন। হয়তো গিয়ে দেখবে উমা কি উমার মা স্নান করছে বা পাশের ঘরের আর একটি বৌ।

যাঃ আসল কথাটাই সে ভুলে যাচ্ছে। কুয়োতলা ফাঁকা থাকলে কী হত। দড়ি বাঁধা বালতিটা ঝুলিয়ে দিয়ে পরে সেটা টেনে তুলতে কি উমার মাকে ডাকত? আর যদি সেই মুহূর্তে পুলক এসে পড়ত।

জিনিসটা চিন্তা করতেও হরিহর ভয় পায়।

॥ ২ ॥

একটা তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পুলক চুপ করে ভাবছে। মাথার ওপর পাখিরা কিচমিচ করছে। বাতাসে একটা বুনো গন্ধ তার নাকে ঢুকছে।

জায়গাটা এখনো তার কাছে নতুন। বছর ঘুরতে চলল কলকাতা শহরের তিনকড়ি কবিরাজ লেনের বাড়ি ছেড়ে এখানে এই ফাঁকায় চলে এসেছে। এখনো আকাশটা দারুণ তাজা বাতাসটা কেমন টাটকা, রোদ থাকলে রোদটাকে কত ঝকঝকে মনে হয়, আর মেঘ থাকলে মনে হয় এমন নীলচে নরম বেগুনি মেঘ যেন আর কোনদিন সে দেখেনি। আজই প্রথম দেখছে।

দাদার সঙ্গে শিয়ালদার ওদিকে কবে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল, একটা ফলের দোকানে যেন থোকা থোকা আঙুর ঝুলতে দেখেছিল সেদিন। নিউ ব্যারাকপুরের আকাশে মেঘ উঠলে সেই সব নীল বেগুনি রঙের আঙুরের কথা তার এখন মনে পড়ে।

কিন্তু সবচেয়ে মজা এখানকার পাখি। পাখি দেখে সে সারাদিন কাটাতে পারে। পাখি দেখে সে এত সময় নষ্ট করে।

যে জন্য ঘরের কাজের দিকে এক কোঁটা মন দিতে পারছে না। যে জন্য বাপের বকুনি খাচ্ছে ধরতে গেলে সারাদিনই।

তিনকড়ি কবিরাজ লেনে পাখি দেখেছে। মাঝে মাঝে

খাঁচায় করে টিয়া ময়না বেচতে এসেছে একটা কালো রঙের মানুষ। ঐ দেখেই সে পাখি দেখার সাধ মেটাত।

আর এখানে ঝোপেঝাড়ে, গাছের আগায় মাঠে আকাশে, যেন রঙ বেরঙের পাখির আর শেষ নেই, নানা রকমের ডাক শিস তাদের। কত রকমের বাসা।

এখানে আসার পর পুলক তার সতেরো বছরের জীবনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। কেবল পাখি দেখে একটা মানুষ সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। অবশ্য ঘরে যদি খাওয়ার থাকে, যদি অন্য কোন ভাবনা চিন্তা না থাকে, আর যদি বয়সের সঙ্গে তার বাবা হরিহরের মতন হাঁপানি ডায়বেটিসে ভুগে ভুগে মানুষটা খিটখিটে না হয়ে পড়ে। হুঁ, স্বাস্থ্যটা ভাল থাকা চাই। অনেকক্ষণ ঘাড় বেঁকিয়ে গাছের ডাল পাতার সবুজ গভীর সমুদ্রে চোখ দুটো ডুবিয়ে রাখার মতন তোমার শক্তি সামর্থ্য থাকা দরকার।

এদিক থেকে পুলক ঠিকই আছে। আরো অনেক – অনেক দিন এমন থাকবে, সতেরো বছর বয়স থেকে তার বাবার মতন আটান্ন বছর বয়সে পৌঁছাতে প্রায় একটা যুগ লেগে যাবে।

অবশ্য তার আগে যদি সে মারা যায়। আলাদা কথা।

যেমন তার দাদা একুশ না পুরতেই চলে গেছে। যেমন তার মা চুয়াল্লিশে না ছেচল্লিশে যেন শেষ হয়েছিল। মার মরাটাকে সে খুব একটা দুঃখের বোলে দেখে না। মা নেই' সময় সময় এই যা একটা শূন্যতা, একটা অভাবের ব্যথা। তা-ও বেশ ক বছর হয়ে গেল। মা মরেছিল কতটা নিজের দোষে। কতকটা বাবার দোষেও বলা যায়।

পুলকদের একটি ভাই হতে গিয়ে ভাই না বোন জিনিসটা আজও পুলকের কাছে অস্পষ্ট থেকে গেছে—যাই হোক ঐ বয়সে আর একটি সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মহিলা চিত্তরঞ্জন সেবা সদন থেকে আর ফিরল না। বাচ্চাটাও সেখানেই নষ্ট হয়।

যেটা সত্যিকার দুঃখ, সাংঘাতিক শোকের ব্যাপার—পুলকের বড় ভাই পিনাকীর মৃত্যু। বাবা অবশ্য জিনিসটা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। এখনো চাইছে। যেন এইজন্য শোক তাপ করে কিছু লাভ নেই। রাজনীতি করতে গেলে পার্টি ফার্টি করতে গেলে অপমৃত্যু কপালে লেখা থাকবেই।

কিন্তু এমন বীভৎস একটা শোক ঝেড়ে ফেলতে চাইলেই কি ঝেড়ে ফেলা যায়। কুড়ি বছরের তরতাজা জোয়ান ছেলে, ঠিক এই দুপুরবেলা, প্রায় তাদের বাড়ির সামনেই, তিনকড়ি কবিরাজ লেনের ঠিক মুখটায়—

প্রথম নাকি একটা পটকার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তারপর নাকি একটা কালো রঙের পুলিশেব গাড়ি ছুটে যে:তে দেখা গেছে, এবং ঠিক ঐ সময়টায় অনেকেই নাকি একটা গুলির আওয়াজও শুনতে পায় দুপুর বেলা, ওদিকটায় কিছু অফিস কাছারী নেই,লোকের বাড়ি আর কিছু দোকানপাট। পাড়ার ভিতর বলে অধিকাংশ দোকান তখন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধও থাকে। গুলির শব্দ হওয়ার পর এবং পুলিশ ভ্যানটা চলে যাওয়ার পর দেখা যায় হরিহর দত্তর বড় ছেলে পিনাকী রাস্তায় পড়ে আছে। রক্তে বক্তে তার শার্ট পাজামা লাল হয়ে গেছে।

পুলক এসব কিছুই দেখেনি। স্কুলে চলে গিয়েছিল। পুলকের বাবা হরিহরও তখন ড্যালহৌসী পাড়ায় তার অফিসে বসে কাজ করছিল। আর নাকি পাড়ার কে একজন বাবাকে অফিসে ফোন করে খবরটা দেয়। বাবা তখনই বাড়ি চলে আসে।

আর পুলক খবরটা শুনেছিল সেই বিকেল পাঁচটায়। স্কুলের ছুটির পর বাড়ি গিয়ে। দাদাকে সে আর দেখেনি। পুলকদের পাশের বাড়ির অরুণের মুখে পুলক সব জানতে পারে। পুলকের বন্ধু অরুণ।

অরুণের কাছেই পুলক শুনল গুলির আওয়াজের পর রাস্তাটা

নাকি একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ সাত মিনিট পরেই নাকি আর একটা পুলিশের গাড়ি ছুটে এসে পিনাকির লাসটা তুলে নিয়ে যায়।

রাত্রের দিকে পুলকের বাবাকে থানায় যেতে হয়েছিল। পুলকও তখন বাবার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পিসেমশাই তাকে যেতে দেয়নি।

খবর শুনে সেদিন বিকেলেই বেহালা থেকে পুলকের পিসেমশাই চলে এসেছিল। আরো দু'চারজন আত্মীয় যে তাদেব এদিকে ওদিকে ছিল না তা নয়। কিন্তু পিনাকীর ব্যাপারটা শুনে একমাত্র পিসেমশাই ছাড়া আর কেউ আসেনি সেদিন।

রাত তখন আটটা, সোওয়া আটটা, পোষ্ট মর্টামের কাজ চুকে যাবার পর নিজের লোকজনকে লাস বুঝিয়ে দেবাব জন্য পুলিশ বাবাকে থানায় ডেকেছিল। লাস নিয়ে পুলকের বাবা আব বাড়ি ফেরেনি। কাকে কাকে নিয়ে সেখান থেকে সোজা শ্মশানে চলে যায়।

এভাবে একটা একুশ বছরের জীবন অকালে শেষ হয়ে গেল। দিন দুই বাবাকে খুব উদ্‌ভ্রান্তের মতন দেখিয়েছিল। তারপর যেন কেমন শক্ত হয়ে যায়। তাবপর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হরিহর বলত, ওই ছোঁড়া রাজনীতি করত, তার কপালে গুলি ছোরা খেয়ে মরা ছাড়া যে আর কিছু ছিল না আমি যে সেটা আগেই টের পেয়েছিলাম'।

সেদিনের পর থেকে এই দু-বছরের মধ্যে কতবারই না বাবার মুখে কথাটা শুনেছে পুলক। কিন্তু পুলক জানে মার কথা বাবা ভুলে গেছে, বা ভুলে থাকতে পারছে, দাদাকে ভুলতে পারছে না।

পিনাকীর শোকে শোকে হরিহর আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অফিসে গিয়ে কাজকর্ম করার ক্ষমতাটুকুও মানুষটা হারিয়ে ফেলল। অসুখ বিসুখ আর তেমন কি। হাঁপানি তো শোনা যায় সেই আঠারো

বছর বয়স থেকেই। ডায়বেটিস তো একটু বয়স হলে ওটা অনেকেরই ধরে। আর হরিহরের যা সুগারের মাত্রা, খুব একটা মারাত্মক কিছু নয়।

লোকে এবার বলছিল বটে, তবে বাবার স্বাস্থ্যটা যে এখানে একেবারে কিছু নয় পুলক তা স্বীকার করতে পারছিল না।

দুবছর হাতে থাকতেই বাবা চাকরি থেকে অবসর নিল। দু'বছর, আর ওদিকে কম করেও একস্‌টেনশন পিরিয়ডের আরো বছর দুই, অর্থাৎ হেসে খেলে আরো অন্তত চার বছর বাবা চাকরি করতে পারত, তার আগেই কিনা—

টাকা পয়সার দিক থেকে হরিহরের আরো লোকসান হয়ে গেল। আসলে ছেলেটা এভাবে মারা গিয়ে হরিহরকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে, হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে মানুষটার। এখন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সামান্য কটা টাকা যা সম্বল। ছোট ছেলেটা এখনো ইস্কুলের দরজাই পার হল না। এই অবস্থায়—

বাবার জন্য একে ওকে কদিন খুবই দুঃখ টুঃখ করতে শুনেছে পুলক। অর্থাৎ দাদা মারা যাবর পর যে কদিন তারা তিনকড়ি কবিরাজ লেনে ছিল। তারপর সেখান থেকে এই এক বছর হলো তারা আস্তানা গুটিয়ে এখানে চলে এসেছে।

বাবা বলত, কলকাতা শহরটা আমার কাছে বিষের মতন লাগছে। চাকরিটা যদি আর না করলাম তো এই নরকে পড়ে থাকা কেন। বাবার কাছে কলকাতাটা নরকের মতন লাগছিল। যে জন্য এখানে এই নিউ ব্যারাকপুরে পিসেমশায়ের বন্ধু অশ্বিনী ভদ্রের বাড়িতে পুলকরা চলে এসেছে। বেহালার পিসেমশাই যদি চট করে বাড়িটা পাইয়ে না দিত তো পুলকদের কলকাতার বাইরে কোথায় যে আজ থাকতে হত বলা মুস্কিল। হয়তো সুবিধে মতন বাড়ি খুঁজে না পেয়ে সেই তিনকড়ি কবিরাজ লেনের অন্ধকূপের

মধ্যেই আজও তাদের থাকতে হত। পিসেমশাই সাহায্য না করলে এত চট করে তারা সেখান থেকে সরতে পারত না।

বাবার সঙ্গে সে একমত।

দাদা মারা যাবার পর কলকাতা শহরটা তার কাছেও খুব বিচ্ছিরি লাগছিল। সারাক্ষণ তার মন খারাপ থাকত। তার সেই নলিনী সরকার ষ্ট্রীটের স্কুল, স্কুলের বন্ধুরা তার কাছে কত প্রিয় ছিল। কিন্তু তখন যেন তার মনে হচ্ছিল স্কুলটাও একটা নরক। স্কুলের বন্ধুরা তার শত্রু মাস্টারগুলিও শত্রু। রাস্তার একটা মানুষকেও তার ভাল লাগত না। বাবার মতন সারাক্ষণ চুপ করে ঘরের ভিতরে বসে থাকতে তার ইচ্ছে করত।

ওফ্, কটা দিন যা গেছে না।

এখন সেসব দিন স্বপ্নের মতন উহুঁ, দুঃস্বপ্নের মতন।

এখন পুলক সারাদিন পাখি দেখে কাটাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস, ঝকঝকে আকাশ, অতসী ফুল রঙের রোদ, আর যখন মেঘ থাকে নীল আঙুর গুচ্ছের মতন থোকা থোকা মেঘ। যত খুশি ছ্যাখো।

দাদার জন্য বাবার লুকিয়ে লুকিয়ে কান্না। বাবা এখনো কাঁদে, সে টের পায়। কিছুতেই মুখে সেটা স্বীকার করবে না যদিও। যেমন পুলকের বুকটাও সময় অসময় নেই দাদার জন্য ছ্যাঁক করে ওঠে—এই একটা দুঃখ দু'জনের মধ্যে,যাকে বলে কমন। এদিক থেকে বাবার সঙ্গে এক। তাছাড়া বাবার অন্য সব দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা?

না, সেসব তার মাথায় নেই।

তার এমন বয়স না যে টাকাপয়সার ভাবনা ভাববে। ডাল ভাত পেলেও খাচ্ছে, মাছ ভাত পেলেও খুব যে একটা সুখী তাও নয়। সতেরো বছর বয়সে খাওয়া একটা সমস্যাই নয়। ক্ষুধার সময় পেটে কিছু পড়লেই হল।

কোনটায় ভিটামিন আছে, কোনটার অভাব। শরীর খারাপ হবে সেসব ভাবনা আটান্ন বছরের হরিহরের। এবং সে সব ভেবে চিন্তে রোজ বাজার খরচ কত ধরা উচিত, অর্থাৎ খরচেও কুলোনো চাই, আবার শরীরও যাতে খারাপ না হয়—সেসব কঠিন কঠিন জিনিস তোমার মাথায় থাকুক, পুলক সেসব নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে যাবে। বাবাকে উদ্দেশ করে সময় সময় সে বলে।

তারপর রান্নার হাঙ্গামা। মাইনে দিয়ে লোক রাখতে গেলে টাকা খরচ হয়। এখন আর চাকরী নেই। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের পুঁজি ভেঙ্গে খাওয়া বুঝে শুনে খরচপত্র না করলে—

বেশ তো, যদি বোঝ যে লোক না রাখলেও চলে যাবে, তুমিই নিজের হাতে উনুনের কাজটা রোজ সেরে ফেলবে পুলকের সেখানে কিছু বলার থাকে কি ? হাতের পুঁজি ফুরিয়ে যাবে—সাধারণ হরিহরের মাথায় এই চিন্তা।

পুলক মনে মনে হাসে, আবার রাগও হয় তার, কম না। যেন বাবা ধরে নিয়েছে পুলক কোনোদিনই একটা পয়সাও রোজগার করতে পারবে না, বাবা তার পুঁজির টাকায় সারাজীবন চালিয়ে যাবে। এভাবে কেউ গোটা জীবন চালাতে পেরেছে ?

এই ধারণা নিয়ে বুড়ো থাকুক। পুলক যেমন চুপ করে আছে থাকবে।

যেমন তার এখানকার স্কুলে নতুন করে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা। হরিহর আর শব্দই করছে না। কলকাতার নলিনী সরকার ষ্ট্রীটের স্কুলটার খুব ডাক আছে না। ওরিয়েন্টের হাইস্কুল। সেই ওরিয়েন্টের ছাত্র সে—প্রাক্তন ছাত্র। ছেলে হিসাবে সে কিছু ফেলনা ছিল না।

মাস্টাররা অনেক দিনই বলেছে পুলকের ফার্ষ্ট ডিভিশন বাঁধা। আর একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে লেটার টেটার নিয়ে ভালভাবেই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় বেরিয়ে যেতে পারে।

হরিহর কি আর সেসব শোনেনি। একদিন তাদের অঙ্কের

টিচার মধুবাবুর সঙ্গে বাজারের রাস্তায় পুলকের বাবার দেখা। মধুবাবু বাবাকে ঠিক ঐ এক কথাই বলেছিল।

বাবা বাড়ী ফিরেই মুখে এতটা হাসি ছড়িয়ে পুলককে ডেকে কথাটা শুনিয়ে দেয়। তখন দাদা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ওটার আশা আমি করি না। তুই ভাল করে পড়ে যা। লেখাপড়া না শিখে জীবনে কেউ কোনোদিন কিছু করতে পেরেছে? মূর্খের রাজনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতি কোনোটা করাই মানায় না।

অর্থাৎ তার প্রশংসা করতে গিয়ে দাদার দিকটাও বাবা সেদিন ঈঙ্গিত করেছিল—পরিষ্কার মনে আছে পুলকের। গাছের পাঁচটা ফল একরকম হয় না। বাবা তখনি আবার বলছিল, আমার তো পাঁচটা সন্তান নেই। দুটো। দুটোই দু'রকম হল। তুই আমায় নিরাশ করিস না পুলক। বলতে বলতে বাবার মুখটা অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

হাসি দিয়ে কথাটা শুরু হয়ছিল—গুরু গম্ভীর আবহাওয়ার ভিতর তা শেষ হয়। বাবা তখন অফিসে বেরোচ্ছে পুলক স্কুলের দেওয়া হোম টাস্ক সেরে গায়ে তেল মেখে স্নান করতে যাচ্ছিল। মেঘলা গুমটের একটি আকাশ। আকাশের চেহারাটা পর্যন্ত তার মনে আছে। সারা বছর কলকাতার আকাশের কী চেহারাই না সে দেখে এল। এখনো ভাবলে কান্না পায়।

হুঁ, সেদিন বাবা যখন মধু মাস্টারের কথাটা তাকে বলছিল তখন তার দাদা পিনাকী বাইরের রকে বসে তার দুটি বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল।"

অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ তখন দারুণ ব্যস্ত। অফিস কাছারী স্কুল কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য কল কারখানা নিয়ে সবাই মাথা ঘামাচ্ছে।

আর পুলকের দাদা একুশ বছরের পিনাকী কিনা ছেঁড়া সার্ট গায়ে ময়লা পাজামা পরনে উসকুখুসকো একমাথা চুল নিয়ে রকবাজ

আরো দুটি বন্ধুর সঙ্গে বসে রাজনীতির আলোচনায় মেতে আছে। এমন অপদার্থ ছেলের জন্য হরিহরের মনে দুঃখ থাকবে না।

না, হরিহর জানত না, পুলক জানত না, সেদিন বেলা সাড়ে বারোটায় তাদের তিনকড়ি কবিরাজ লেনের ঠিক মুখটায় রক্তের বিছানায় শুয়ে পিনাকী চিরকালের জন্য চোখ বুঁজবে।

এই ছাখো, কোন্ কথা ভাবতে গিয়ে কোন্ কথায় সে চলে এল। পুলক নিজের মনে হাসে।

এখানে তার নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়া। বাবা একেবারে চুপ। বাবার ভয়টা কি পুলক টের পায় না। নতুন জায়গা। স্কুলে ভর্তি হওয়া মানে আর পাঁচটি সমবয়সী ছেলের সঙ্গে মেলামেশা। যে ভয় নিয়ে হরিহর কলকাতার বাস চুকিয়ে এখানে চলে এল। পুলকের বয়সটাও খারাপ—খুব সাবধানে যেন বাইরের ছেলেদের সঙ্গে তাকে মেলামশা করতে দেওয়া হয়। দাদার ঘটনার তিন চারদিন পর বেহালার পিসেমশাই বাবাকে সাবধান করে দিয়েছিল। বাবার তখনকার আতঙ্কের চোখটা পুলক ভুলতে পারছে না।

পিসেমশায়ের কথাটা শেষ হয়নি। তার মাঝেই ভগ্নিপতির দুটো হাত চেপে ধরে বাবা হাউ হাউ করে উঠেছিল: আজ দু রাত আমার চোখে ঘুম নেই তারক, তুমি একটা বাড়ি টাড়ি কোথাও খুঁজে দাও, আমি আর এই নরকে থাকব না, ক' রাত ধরে আমার চোখে ঘুম নেই, কলকাতা আমার কাছে বিষের মতন লাগছে।

পিসেমশায়ের হাত ধরে বাবা শিশুর মতন কাঁদছিল। ঠিক আছে, যদি সত্যি এখান থেকে তুমি সরে যেতে চাও, আমি চেষ্টা করব—অবিশ্যি চেষ্টা করব, আমার জানাশোনা মানুষ আছে, আমার বন্ধু, অশ্বিনী ভদ্র, নিউ ব্যারাকপুর বাড়ি করেছে, বেশ বড় টালির বাড়ি, তার দুখানা ঘর নাকি পড়ে আছে সেদিন আমায় বলেছিল। ভাড়াটে খুঁজছে সে।

শুনে বাবা হাতে চাঁদ পায়।

তাই ভাল, আপাতত আমাকে আর একটা ছেলের মুখ দেখে বাঁচতে হবে তারক। পুলককে আমি হারাতে দিতে পারি না। পুলকও যদি এভাবে নষ্ট হয় আমি একদিনও বাঁচব না। যত শিগগির পার আমাকে এখান থেকে পার করার ব্যবস্থা কর।

দোরের পাশে দাঁড়িয়ে পুলক তার বাবা ও পিসেমশায়ের কথা শুনছিল। নষ্ট হওয়া অর্থে প্রথমটা সে ধরে নিয়েছিল দাদার মতন রাজনীতি করতে করতে বসে যাওয়া।

পুলকও যদি পিনাকীর মতন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রকবাজ ছেলেদের সঙ্গে মিশে বোমা পিস্তলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

কথাটা সে যত চিন্তা করছিল তার বুকের ভিতর কাঁটার মতন খোঁচাচ্ছিল। সত্যি কি তার দাদা এবং যাদের সঙ্গে দাদা রাজনীতি করতে নেমেছিল তারা বখাটে ছেলে ছিল? সেই অর্থে তারা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলা যায় কি? দাদার মুখটা মনে পড়ে টপ টপ চোখের জল পড়েছিল পুলকের।

সবটা দুপুর সবটা বিকেল কথাটা ভাবল সে। চারদিকের ঘর বাড়ি মানুষ গাড়ি শব্দ আজো কেমন সাংঘাতিক খারাপ লাগছিল' তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

যেন কেবল তিনকড়ি কবিরাজ লেনের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বাড়িটা না, সবটা কলকাতা শহরই তার চোখে বিষের মতন লাগছিল —লাগছিল এই কারণে আগের মতন সেখানে গাড়িঘোড়া চলছে, মানুষজন দিব্যি হাসছে কথা বলছে ছুটোছুটি করছে, সিনেমা থিয়েটার দেখছে, রেষ্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে, অফিস কাছারি করছে, পার্কে ছেলেরা খেলছে, মেয়েরা সেজেগুজে বেড়াতে বেরোচ্ছে, দুবেলা লাইন দিয়ে লোকে রেশন ধরছে, জামাকাপড়ের দোকানগুলিতে আগের মতন ভিড় ভিড়—ফুটপাতে ভিড়, ট্রামে বাসে ভিড়, বাজারে দশ টাকা কেজির ইলিশ চিংড়ি পড়তে পারছে না, বারো টাকা কেজির রুই কাতলা হুমড়ি খেয়ে পড়ে কিনছে লোকে—ঘড়ির কাঁটার মতন সব

ঠিক আছে, চমৎকার ঘুরে ঘুরে সব চলছে, আজ চলছে কাল চলবে পরশু চলবে, তার পরদিন, তার পরদিন—কেবল একটা জিনিস চলল না; কোন দিনই আর চলবে না, হঠাৎ থেমে গেছে, হারিয়ে গেছে, চিককালের মতন তিনকড়ি কবিরাজ লেনের একটা একুশ বছরের ছেলের হাসি কথা ছুটোছুটি বন্ধুদের সঙ্গে রকে বসে ফিসফাস, তারপর চোরের মতন বাড়ি ঢুকে অবেলায় চান করা ভাত খাওয়া, ভাত খাওয়া কি বাপের বকুনি, খেয়ে ভাত না খেয়ে আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া—এই জন্মের মতন ফুরিয়ে গেল, শেষ হল।

রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল পুলকের। তিনদিন সে স্কুল কামাই করেছে। কাল থেকে আবার স্কুলে যাবে ঠিক করেছিল। আজ সকালেই ঠিক করেছিল। কিন্তু, রাত তখন দুটো বেজে গেছে, পুলকের চোখে ঘুমের বদলে ঘুরে ফিরে দাদার মুখটা ভাসছিল, আর সেই মুহূর্তে শহরের চেহারাটা মনে পড়তে রাগে দুঃখে ঈর্ষায় তার বুকের ভিতর জ্বালা করে উঠল।

সেই নলিনী সরকার ষ্ট্রীটের ওরিয়েণ্ট হাই স্কুলের হলদে দোতলা বাড়ি। সাতশ ছেলে বইখাতা হাতে পড়তে যাচ্ছে। আজ গেছে। কাল যাবে পরশু যাবে। সাতশ ছেলের সঙ্গে পুলক কাল থেকে আবার মিশে যাবে, ক্লাসের ভেতর বসে ব্ল্যাক বোর্ডে হলদে পাঞ্জাবি পরা মধু মাস্টারের অঙ্ক কষা দেখবে, পরের ঘণ্টায় ইংরেজী, তার পরের ঘণ্টায় সিভিক্স, তারপর টিফিন, সাতশ ছেলে, কুড়িজন মাস্টার পাঁচজন দপ্তরী দুজন দরোয়ান—সবাই আছে, কেউ হারায়নি, কেবল এখানে, এই যার তক্তপোষের বিছানায় পুলকের পাশের জায়গাটা খালি পড়ে আছে—কোনদিন আর জায়গাটা ভরবে না—রাজনীতি করে অনেক রাত্রে চোরের মতন ঘরে ঢুকে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় ছেড়ে দিয়ে একটি নষ্ট ছেলের ভুসভাস নাক ডাকান বন্ধ হয়ে গেল।

সকালে পিসেমশায়ের সঙ্গে দাদার কথা বলতে গিয়ে বাবা কি অর্থে "নষ্ট" শব্দটা উচ্চারণ করেছিল ভেবে ভেবে পুলক সেদিন সারারাত কেঁদেছিল।

বাবার ওপর দুর্জয় অভিমান নিয়ে ছটফট করছিল সে কম না। পরদিন সকালে তার মাথাটা ঠাণ্ডা হয়। নষ্ট বলতে বাবা বোধকরি এই বোঝাতে চেয়েছিল অকালে একটি প্রাণ এই সংসার থেকে খসে পড়েছে, অসময়ে একটি ফুল শুকিয়ে গেল—কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওপর থেকে পুলকের সব রাগ অভিমান চলে গেল। বরং বাবার জন্য তখন কষ্ট হতে লাগল। তাই কি বাবার কাছে এক একটি সন্তান ফুলের মতন।

একটি ফুল ঝরে পড়েছে। হরিহর আর একটি ফুলকে অকালে হারাতে দিতে চাইবে কেন। পুলককে দু হাতে আগলে ধরে রাখবে।

বাবার কলকতা ছাড়ার উদ্দেশ্যটা মূলতঃ ঠিক তাই না। পুলকের জন্য ভয়।

এবং এখানে এসেও ভয়টা কাটছে না। কি জানি নতুন জায়গা, নতুন স্কুলের কেমন সব ছেলেটেলে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে পুলক যদি—

বাবার এই ভয়টা যদিও বাজে। পুলক অনেক সময় চিন্তা করে, দাদার মতন কোনোদিনই সে রাজনীতি করবে না, পৃথিবীতে সবাই সব কাজ করতে পারে না। কথাটা বুঝিয়ে বললেও কি বাবা বুঝবে? যে জন্য পুলক চুপ করেই আছে।

তাছাড়া এখানের স্কুলের বাড়িটা সে কদিনই ঘুরে দেখে এসেছে। লাল টালিওয়ালা ব্যারাক বাড়ির চেহারার লম্বা একটা ঘর। দু'শ আড়াইশ-র বেশি ছাত্র হবে না। মাস্টারও বড়জোর দশ জন।

তাদের নলিনী সরকার স্ট্রীটের এমন জমজমাট স্কুল ছেড়ে এসে এখানকার ঐ ধেদ্দেড়ে স্কুলটায় গিয়ে পড়াশোনা করতে খুব একটা মন উঠলো না। যাক না ক'দিন। বাবার ভয়টয়টা কাটুক। বরং

এই বেশ আছে সে? ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখছে, মাঠ দেখছে আকাশ দেখছে, আর রঙ:বেরঙের পাখি। অগুনতি পাখি।

॥ ৩ ॥

—ছেলেকে দেখছি না। কোথায়?

—বন বাদাড়ে ঘুরছে। ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে রেখে হরিহর ঘাড় সোজা করে দরজার দিকে তাকাল। উমার মা সামনেই আলো করে এসে দাঁড়ায়।

উমার মার গড়নটা সুন্দর। গায়ের রঙেরও বুঝি তুলনা হয় না। তার ওপর ওই তো টানা-টানা চোখ। দুগ্‌গা ঠাকরুনের মতন টিকলো নাক। তুলির আঁকা ভুরু জোড়া, আর কেমন ঠাসা ঠাসা একখানা চিবুক। যেন চিবুকের মধ্যে একটা গর্ব একটা ব্যক্তিত্ব লুকোন রয়েছে।

এখানে এসে হরিহর তার ভগ্নিপতি তারকের বন্ধু পত্নীটিকে দেখে এত বেশি চমকে উঠেছিল।

এই জীবনে স্ত্রীলোক কি আর কম চোখে পড়েছে তার, তা ছাড়া এটা আধুনিক যুগ।

যখনই তুমি রাস্তায় পা বাড়াবে, যখনই যে ট্রামে বাসে চাপবে, কি একটা পার্কে ঢুকতে যাও, বা যখন নিত্যকার বাজার সওদা করতে হাটে বাজারে দোকানে ঢোকা হয়, যদি সেসব জায়গায় দশটা পুরুষ তোমার চোখে পড়ে, অন্তত কম করেও চারটি পাঁচটি মেয়েছেলে চোখে না পড়ে পারে? অনেক সময় সংখ্যার দিক থেকে পুরবালারা যেন পুরুষকেও ছাপিয়ে যায়। অবশ্য কলকাতা শহরের মতন একটা বে আক্কেল বিদঘুটে জায়গার দৃশ্যটিশ্যগুলোর কথাই বলা হচ্ছে।

ধরতে গেলে সারাজীবনই হরিহর ঐ নরকের মধ্যে থেকে এল

কিনা কোনোদিন ইচ্ছে হল, বিকেলে অফিস ফেরতা একটু হাওয়া খেতে ধারেকাছের একটা পার্কে হয়তো ঢুকে পড়ল। শরীরটা ক্লান্ত। একটু বসে জিরোবার জন্য ঘাড ঘুরিয়ে বেঞ্চি খুঁজছে। কোথায় বেঞ্চি। দেখল সব একটা জুড়ে বসে আছেন দেবীর দল।

অনেক সময় এক একটা বাসের ভিতরেও এই অবস্থা। কতদিন দেখেছে হরিহর। যেদিকে চোখ ফেরাবে কেবল মায়ের জাত। দাঁড়িয়ে রড ঝুলে ধাক্কাধাক্কি করে বাসে উঠতে শ্রীমতীরা পুরুষকে টেক্কা দিয়েছে কত সে দেখল।

কাজেই পুলক ও পিনাকীর মা বা তিন কড়ি কবিরাজ লেনের এবাড়ির ওবাড়ির গিন্নীবান্নী বৌ ঝি-দের ছেড়ে দিয়েও কম করে তার আটান্ন বছরের জীবনে লাখ দেড় লাখ, আরো বেশি, স্ত্রী-মূর্তি কি হরিহরের চোখে পড়েনি? আরো বেশি। হরিহর মনে মনে হিসেব করে দেখেছে।

কিন্তু তার সব দেখা হার মানল নিউ ব্যারাকপুরের অশ্বিনী ভদ্রের বাড়িতে এসে।

প্রথমটা উমার মা হরিহরের সামনে আসত না। বা যদি কখনো সামনে পড়ে গেছে, মাথায় ঘোমটা টেনেছে। তখনো অশ্বিনীবাবু বেঁচে। তা ঘোমটা টানলেও দেহখানা তো লুকানো যায় না। অপূর্ব ভঙ্গিমার একখানা কাঠামো হরিহর তখনই লক্ষ্য করেছিল। এবং হাত পা দেখে বুঝতে পেরেছিল কাঁচা সোনার মতন গায়ের রঙ অশ্বিনী গিন্নীর।

মহিলা যখন কুয়োতলার দিকে গেছে কি উঠোনের তারে কাপড়টাপড় শুকোতে দিচ্ছে নিজের ঘরে বসে হরিহর তাকিয়ে থাকত।

তাছাড়া একটা উঠোন, একটা কুয়ো, বাড়িতে ঢোকার রাস্তাও একটা। সাধারণ ঘরের ভাড়াটে হলেও হরিহর এই বাড়িরই

একজন। যে জন্য চলতে ফিরতে উঠতে বসতে দিনের মধ্যে একবারই সুন্দর মানুষটাকে তার চোখে পড়ত।

কিন্তু এভাবে চোখে পড়া আর আজ। বছরটা ভাল করে না ঘুরতে যেভাবে চমৎকার সহজে ভঙ্গি নিয়ে মহিলা হরিহরের সামনে এসে দাঁড়ান।

দাঁড়ান কেন, কদিন আগে শরীরটা খুব বেশি খারাপ হয়ে পড়তে হরিহর বিছানা নিয়েছিল, তখন তার ঘরের রান্নাবান্না একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল না। তখন উমার মা কদিনই এসে এ ঘরের বাপ বেটার ভাত তরকারী বেঁধে দেয়নি। পুলক উনোনটাও ধরাতে পারে না। ভাত বাঁধতে গেলে হাত পুড়িয়েছে, নয়তো ভাত পুড়িয়ে ছাই করেছে—সে জন্য বাধ্য হয়ে, উঁহু অশ্বিনীবাবুর স্ত্রীকে না, অশ্বিনীবাবুর মেয়েকেই হরিহর প্রথম ডেকেছিল, অন্তত হাঁড়িটা নামিয়ে ফেনটুকু যাতে গেলে দেয় বা উনোনটা ধরিয়ে দেয়। উমা পনেরো ষোল বছরের ফুটফুটে মেয়ে যেমন দেখতে তেমনি মিষ্টি নরম স্বভাব। মোটেই কলকাতার মেয়েদের মতন নয়। মেয়েও না মাও না—

হুঁ, যে কথা বলা হচ্ছিল—উমা একবেলার মতন রেঁধে বেড়ে সব গুছিয়ে টুছিয়ে রেখে গে । হরিহর যে কী খুশি হয়েছিল না। কিন্তু পরদিন সে দারুণ অবাক হয় অশ্বিনীবাবুর স্ত্রীকে তার ঘরের কাজে হাত লাগাতে দেখে।—সে কি, আপনি কষ্ট করছেন কেন। হরিহর এত লজ্জা পেয়েছিল।

তাতে কি। আমার কি হাতে বাত নেমেছে। উমার মা সঙ্গে সঙ্গে হেসে উত্তর করেছিল।

সংকোচটা কেটে গিয়েছিল মাস দু তিন আগেই। ঐ যে বলে ঈশ্বরের মতিগতি। তা না হলে বলা নেই কওয়া নেই, অফিসের চেয়ারে বসে কাজ করতে ষ্ট্রোক হয়ে অশ্বিনী ভদ্র এভাবে স্ত্রী-কন্যাকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ একদিন চলে যেতে পারে। ভদ্রলোকের ছেলে

নেই। কী অবস্থার মধ্যে পড়েছিল মহিলা ঐ দুর্ঘটনাটার সময় মেয়েটাকে নিয়ে। টাকা পয়সা আছে।

ভাল চাকরি মানে উপরি পাওনা টাওনার ব্যাপার ছিল৹ অশ্বিনী বাবুর। সাত কাঠা জমির ওপর এই বাড়িটা ছাড়াও বেশ দু পয়সা ব্যাঙ্কে রেখে যেতে পেরেছে। কিন্তু টাকা পয়সা কি সব। একটা পুরুষ নেই যার—এদিক ওদিক দেখে কে।

পাশের ঘরের অশ্বিনী ভদ্রের আর এক ভাড়াটে কুলদা গুপ্তকে মেয়েছেলে বললেও হয়।

রেলের চাকরি। চাকরি আর ঘর, মানে বৌ। এ ছাড়া কুলদা মশাই আর কিছু চেনেন না। চিনতে চানও না। ছেলেপুলে হয়নি। আর হবে তার আশা নেই। কর্তা গিন্নী দুজনেরই এখন প্রায় চুল পাকার বয়স।

যাই হোক সেদিন উমাদের বিপদে হরিহরকেই এগিয়ে যেতে হয়েছিল। খারাপ শরীর নিয়েও খবরটা পাওয়া মাত্র অশ্বিনীবাবুর সেই ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের অফিসে ছুটে যাওয়া, অফিসের লোকেরাও অবশ্য খুবই সাহায্য করেছিল, লরী ভাড়া করে ডেডবডি কলকাতা থেকে এখানে আনা, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করা— তারপর শ্রাদ্ধ শান্তির আয়োজন, হরিহর সব ব্যাপারেই ছিল। সব কিছু তাকে দেখতে হয় কথাটা উমার মা আজও বলে। সেদিন আপনি না থাকলে আমার যে কী দশা হত পুলকের বাবা।

পুলকের বাবা হরিহর একটু চুপ করে থেকে পরে হাসে। আপদে বিপদে মানুষ যদি মানুষকে না দেখে, যদি সাহায্য না করে তবে আর মানুষ হয়ে জন্মান কেন।

দুটো পরিবারের ঘনিষ্ঠতা তখন থেকে শুরু। উমার বাবা যেদিন চোখ বুঁজল।

তারপর কোনোদিনই উমার মা হরিহরকে দেখে মাথায় ঘোমটা টানেনি। হরিহর যেমন মা মেয়ের অসুবিধা কষ্ট দেখতে সর্বদা

এগিয়ে গেছে তেমনি উমার মা সুধারাণীও কিছু চুপ করে নেই। দরকার হলেই এঘরে ছুটে আসছে, হাত লাগিয়ে এটা ওটা করে দিচ্ছে।• হরিহর আপত্তি করলেও মহিলা তা গায় মাখছে না।

বরং বলা যায় হরিহরের দ্বিধা সংকোচ আড়ষ্টতার ভাবটা এখনো কাটেনি। কিন্তু উমার মার মধ্যে এক ফোঁটা জড়তা নেই, 'কিন্তু কিন্তু' ভাব নেই। জানালা খুলে দিলে সকাল বেলার রোদ হাসতে হাসতে ঢোকে বৃষ্টির ছাঁট ছেলে মানুষের মতন ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে—সুধারাণীর মধ্যেও সেই স্বচ্ছন্দতা, উচ্ছ্বাসভরা অদ্ভুত সরলতা এই বয়সেও। বাধা দেবার উপায় নেই। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকলেও একসময় তোমাকে মুখ তুলে তাকাতে হবে। তুমি জোব করে গম্ভীর হয়ে থাকবে কতক্ষণ, হাসতে হবে তোমাকে, তোমার মুখে যতক্ষণ না হাসি ফুটবে ততক্ষণ উমার মা হাসি হাসি মুখ করে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কি হল। মনে হচ্ছে মনটা আজ ভাল নেই পুলকের বাবার।

পুলকের বাবা ঘাড় গুঁজে থেকে একটা কিছু যেন লুকোয়।

তা এত বেলা করে আজ উনুনে আঁচ পড়ল কেন। এই তো ডাল হল শুধু দেখছি। তরকারী রান্না হয়ে গেছে? হরিহর তবু নীরব।

এবার উমার মা একটু অপ্রস্তুত হয়। ঘাড ফিরিয়ে রৌদ্রের রঙ দেখে। তখন হরিহরও কেমন না চুরি করে ঘাড়টা সোজা করে সুধারাণীকে দেখে। যৌবন নেই ঠিকই কিন্তু যৌবনের কত ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে ঐ দেহের মধ্যে মহিলা সাজিয়ে রেখেছে এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। ঐ অতুল সম্পদ নিয়ে নিঃসন্দেহে আজও যে কোন যুবতীকে মহিলা বুড়ো আঙ্গুল দেখাবার ক্ষমতা রাখে। উনুনের আঁচে হরিহর চান করে এসে নতুন করে ঘামছিল।

সকালে কারা যেন এসেছিল দেখলাম। উমার মা এদিকে চোখ ফেরাল। ভাতের ফেন গালা শেষ করে হরিহর হাঁড়িটা

সোজা করে বিড়ের উপর বসিয়ে দিল। মাথা তুলল না। মাথা না তুলে বলল, হুঁ এসেছিল, পুরোনো বন্ধু তিনজন।

--তাই আগে আঁচ করেছি তখন, এলো গল্পটল্প করে চলে গেল। একটু চুপ থেকে সুধারানী আবার বলল তাই না এতটা বেলা হয়ে গেল আপনার। পুলককে অনেকক্ষণ দেখছি না। কোথাও পাঠিয়েছেন।

কোন্ কাজে পাঠাব। এবার হরিহর সরাসরি মুখ তুলে তাকাল। ও কি ছাই আমার সংসারের কোন কাজ করে। আপনি কি চেনেন না ছোঁড়াকে, আমি কি নতুন এসেছি এ বাড়ি।

এবার সুধারাণী বুঝল। হাসল। হরিহর কেন এতটা গম্ভীর। ছেলের ওপর খুব চটে আছে।

তা আপনি আমাকে বলতে পারতেন, আমি তৎক্ষণ উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম।

আরে ছি। অসুখ করে আমি কি বিছানা নিয়েছি—আপনারা আমার জন্যে অনেক করেন, যথেষ্ট করেন, আপনি, আমার মা উমারাণী। আপনাদের দুজনের ঋণ কি এই জন্মে শোধ করতে পারব।

আহা, ও কথা বলবেন না উমার মা দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। যেমন টুসটুসে আশ্চর্য রঙের ছোট পাতলা জিভ, তেমনি তার দাঁতের সবই ঝকঝকে মুক্তো। হরিহরের চোখের পলক পড়ছিল না।

—ছেলে মানুষ, উমার মা বলল, ওর কি সেই দায়িত্ববোধ জন্মেছে, ও কি বোঝে যে, বাবা একলা হাতে এটা ওটা করছে, বাবার কষ্ট হয়, এই বয়সের ছেলে এমনই হয়।

হুঁ, এমন হয়। হরিহর ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। ছেলে মানুষ! গোঁফ দাড়ি গজাবার বাকি কত। বলে কিনা ন বছরে যার হল না, নব্বুই বছরে তার কিছু হয় না। ঐ শূয়োরটার এই জন্মে আর আক্কেল বুদ্ধি হবে—আমার তো মনে হয় না।

রান্নার আর কি বাকী আছে? দোরে দাঁড়িয়ে সুধারাণী লম্বা

করে ঘাড়টা ঘরের ভিতর বাড়িয়ে দিল। উমাকে পাঠিয়ে দেব।

আমি অবিশ্যি চান করে ফেলেছি, এখন আর—

না না, ছি ছি। এবার হরিহর একটু করে হাসল। কি যে বলেন, আপনি আমার হেঁসেলে ঢুকবেন, এই ভরদুপুরের গরমে, উঁহু, মেয়েকেও পাঠাতে হবে না। আমার রান্না হয়ে গেছে, আলু ভাতে দিয়েছি, এবার ডাল চাপাব।

ইস্, অনেক বেলা হয়ে গেল, একটু আগে যদি আমাকে ডাকতেন। আক্ষেপের সুর সুধারাণীর গলায়। দরজা ছেড়ে দিয়ে উঠোনে নামল।

হরিহর তাকিয়ে থাকল। বিধবার রঙ্গিন কাপড় পরতে নেই। তা নাই বা পরল। সরু কালো পেড়ে সাদা শাড়িতে মানুষটার রূপ শতগুণ বেড়ে গেছে। যেন আশ্বিনের সকালের শিউলি ফুলের একটা পরিচ্ছন্নতা ঘিরে রাখে ওই শরীরে। অবশ্য ফুলের ভাবনাটা বেশীক্ষণ থাকল না হরিহরের।

উমার মার সুন্দর পিছনটা দেখে অন্য ছবি হরিহরের মনে জাগল।

অশ্বিনী ভদ্রের মস্ত উঠোনটাকে মনে হচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড দীঘি। যেন চকচকে রোদ্রের জল নিয়ে ঝলমল করছে। আর জলের ওপর দিয়ে একটা রাজহংসী ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।

হরিহর কোনোদিন কবিতা লেখেনি।

কিন্তু যখনই উমার মাকে দেখছে, একটা কবিতার মতন কিছু তার মনটাকে দুলিয়ে দিচ্ছে, বুকের ভিতর অন্য রকম একটা আলোড়ন অনুভব করে সে।

তা বলে কি হরিহর অসংযমী। মোটেই না। এতটা বয়স হল এই অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না।

আর অসংযম করার সময়ই বা পেল কোথায়। লেখাপড়া

শেষ করে যা হোক একটা চাকরি যখন জুটল তখন আর পাঁচটা বাঙ্গালী ছেলের মতন বিয়েও একটা করতে হল।

ঘরে বুড়ো বাবা। মা আগেই স্বর্গে গিয়েছিল। বুড়ো বাবার সেবা যত্ন করে কে। কাজেই ছেলের একটি বৌ না আনলে নয়। তেমন কিছু চাকরিও নয়। মাসের মাইনেয় সারা মাস কুলোতে চায় না। দেখতে দেখতে বাচ্চা হল। দেড় দু বছর পার না হতে আবার একটি সন্তান।

ধরতে গেলে প্রায় সারাটা জীবনই কোনোরকমে খেয়ে পরে বাড়িভাড়াটা পরিষ্কার রেখে মুদীর পাওনা গয়লার পাওনা ফেলে না রেখে ধুঁকতে ধুঁকতে দারিদ্রের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আসা। খুব বড় চাকরি না করলে বা কালো বাজার না ঘুরলে ঘুষ না খেলে চুরি না করলে সৎভাবে জীবন কাটাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষকে যা করতে হয় যে ভাবে বেঁচে থাকতে হয়।

আশা ছিল একদিন দিনের নাগাল পাবে। পিনাকী পুলক বড় হয়ে উঠেছে। দুই ছেলে লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করলে হরিহরকে আর পায় কে।

কিন্তু হল না, আশা মিটল না?

তুই যে রাজনীতি করলি, তুই যে বুকের রক্তে তিনকড়ি কবিরাজ লেনের মুখটা ভাসিয়ে দিলি তাতে তোর বাপের গায়ের ছেঁড়া সার্ট পায়ের ছেঁড়া জুতো সরে গিয়ে নতুন জামা জুতো উঠল। তিনকাঠা জমি কিনে একটা ঘরটর তুলে মাথা গুঁজবার জায়গা করতে পারল? এই বয়সে এখনো নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে খায়। একটা লোক রাখার ক্ষমতা নেই। নিয়ম করে এক পোয়া দুধ কিনে খাবে সেই সাহস পায় না।

কাজেই এই জীবনে আমোদ ফুর্তি করা, সংযমের গেরোটা মাঝে মধ্যে একটু ঢিলে করে দিয়ে, যা আর পাঁচটা স্বচ্ছল সুখী মানুষ করে, একটু অসংযমের হাওয়া গায়ে লাগান, হরিহর কোনোদিন তার

সুযোগ পায়নি। আর পাবে? পুলককে দিয়ে কী আশা কতটা আশা। ঐ তো ভয়ে ভয়ে কলকাতা শহর ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে চলে এসেছে এখানে। কি জানি এই শ্রীমান আবার কি করতে গিয়ে কি করে বসে। বলা তো যায় না। রক্ত গরম। বড়টার মতন ওটার মাথায়ও কে আবার কোনোদিন বোমা পিস্তলের বীজমন্ত্র ঢুকিয়ে দেবে, তারপর বড়টার মতন ওটাও একদিন।

থাক কদিন ইস্কুলের পড়াশুনো বন্ধ। বনবাদাড়ে ইচ্ছা মতন ঘুরে বেড়াক। তবু আমি একদিক থেকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাই।

—কে এলি রে?

—আমি। পুলকের গলা

হরিহর ডালের কড়াটা উনুনে চাপিয়ে দিল।

—এখনো রান্না শেষ হল না তোমার বাবা? পুলক রান্নার জায়গায় এসে উঁকি দিল। টের পেয়েও হরিহর ঘাড় সোজা করল না। শব্দ করল না।

—তোমার বন্ধুরা হঠাৎ এসেছিল কেন আজ? পুলক আবার প্রশ্ন করল।

—তা কি করে বলব কেন এসেছিল। শুকনো গলায় হরিহর উত্তর করল।

—ওঁদের শুধু চা বিস্কুট খাইয়ে বিদেয় করলে। পুলক বলল।

—কি খাওয়াতাম? সন্দেশ রসগোল্লা? তেতো গলায় হরিহর জবাব দিল। চোখ তুলে ছেলের মুখটা দেখল সে। রোদে ঘুরে লাল হয়ে গেছে। মাথার চুল বড় হয়েছে।

—চুল কাটবি না? কেমন দেখাচ্ছে তোর মাথাটা।

—পয়সা দাও। পুলক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল। পয়সা দিলেই চুল কাটতে পারি।

ব্যস, এবার হরিহর চুপ। মনে মনে পুলকও খুশি হয়। বাবা কদিন ধরে তার মাথার দিকে কোন কারণেই চুল কাটার কথা বলছে, আর যেই না পুলক পয়সা চাইল, যেহেতু বিনি পয়সায় কোনো পরামানিক তার চুল ছেঁটে দেবে না, হরিহর সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল। অন্তত সেদিনের জন্য চুল কাটবে কথা আর বাবার মুখ দিয়ে বেরোবে না। আজও তাই হল।

চুপ করে হরিহর ডালে কাঁটা দেয়।

—মুসুর ডাল? পুলক শুধোয়।

—হুঁ,। হরিহর উত্তর করে।

—রোজ মুসুর ডাল ভাল্লাগে না। মুগ করতে পার না?

—তিন টাকা কাঁচা মুগের কেজি। বাজারের কিছু খোঁজ খবর রাখিস্। হরিহর মুখ ঝাম্‌টা লাগায়। সারাদিন তো আছিস বনবাদাড়ে।

বকুনি খেয়ে পুলক একটু থমকে থাকে।

—চান টান করতে হবে? না কি হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি, বেলা কটা বাজে খেয়াল রাখিস? হরিহর আর একটা ধমক লাগায়।

পুলক গায়ের গেঞ্জিটা টান মেরে খুলে ফেলল।

—পাজামাটা কেচে দিস কেমন ময়লা হয়েছে, তোর দিকে তাকান যায় না।

—সাবানের পয়সা দিলেই কাচতে পারি। পুলক ফস করে উত্তর করল।

হরিহর আবার চুপ।

পুলক এবারও মনে মনে খুশি। চুল কাটার মতন জামা কাপড় কেচে দেবার ব্যাপারেও সাবান কেনার পয়সা চাওয়া মাত্র বাবা চুপ করে থাকবে জানা কথা।

—মুসুর ডাল লাগে না, মুগের ডাল চাই বাবুর! হরিহর

গজগজ করতে লাগল। পেট ভরে লোকে একবেলাই খেতে পাচ্ছে না, কেমন আগুন লেগেছে বাজারে। চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে। একদিক টানতে গেলে আর একদিক কুলোচ্ছে না, আর আমার কর্তার মুখে কেবল অমুক খাব আর তমুক খাব। আমার জমিদারী আছে কি না।

এবার পুলকের মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। এবার বাবার ওপর তার ভীষণ রাগ হতে লাগল।

--ইস্, আমি যেন কত কী খাবার কথা বলছি সারাদিন। একেবারে জমিদারী টমিদারীতে চলে যাচ্ছে।

—হুঁ, যাব না! হাবহর চুপ থাকে না। লেখা নেই পড়া নেই। কেবল টই টই করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। বলি বয়স কি কম হয়েছে।

—ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেই হয়। আমি কি বলছি বনে জঙ্গলে ঘুরতে আমার ভাল্লাগে। আমার কি ইচ্ছে করে না আবার ইস্কুলে টিস্কুলে যাই। কত ভাল ইস্কুল ছেড়ে চলে এলাম।

সরাসরি বাবার মুখের দিকে তাকায় না পুলক। ঘরের বেড়ার দিকে চোখ রেখে অনেকটা যেন নিজের মনে কথাগুলি বলে। বাবা শুনতে পাক এমন করেই বলে যদিও।

হরিহর চুপ। পুলক জানে বাবা আবার এখন চুপ করে থাকবে। যেমন একটু আগে চুল কাটার পয়সা চাইতে চুপ করে গেল, যেমন কাপড় জামা কাচার কথায় সাবানের পয়সা চাইতে চুপ করে আছে।

কিন্তু এবার পুলকের ভাবনাটা যেন পুরোপুরি হয় না। ডালে সম্বার দিয়ে উনুন থেকে কড়াটা নামিয়ে রেখে ছেলের দিকে মুখ ফেরাল হরিহর।

—লেখাপড়ার কথা বললেই উনি ইস্কুল দেখাচ্ছেন আমাকে। কেন, ওরিয়েন্টের বইটইগুলো সঙ্গে আনা হয়নি! ঘরে বসে

একটা দুটো বই নেড়েচেড়ে দেখলে কী হয়। তবু তো কিছুটা শেখা হয়।

—নিজে নিজে পড়লে সব কিছু বোঝা যায় নাকি।" পুলক তৎক্ষণাৎ জবাব দিল। তবে আর লোকে ইস্কুলে যায় কেন। মাস্টারমশায়রা এটা ওটা বুঝিয়ে দেন—তবে তো ভাল করে সব শেখা যায়!

—ভাল করে শেখা যায়। রবিঠাকুর ইস্কুলে পড়েনি জানিস? কত বড় একটা লোক ছিল দেশের। কত তার জ্ঞান ছিল!

বাবার কথার ধরণে পুলকের এত হাসি পেল। হাসল না অবশ্য। কেন না তা হলে মানুষটা আরও চটে যাবে।

—হুঁ, গম্ভীর হয়ে পুলক বলল, আমি যদি রবিঠাকুরের মতন কবিতা লিখতে পারতাম তা হলে আমিও ইস্কুলের নাম মুখে আনতাম না। কিন্তু দুটো একটা পাশ করে আমাকে যে একটা অফিস টফিসে ঢুকে পড়তে হবে। বিএ, এম এ, পাশ, না করলে কোথাও ঢোকা যাবে না।

—বিএ, এমএ, পাশ করে হাজার হাজার ছেলে ঘোড়ার ঘাস কাটছে সে খবর রাখিস?

পুলক মুখটা কালো করে কেমন।

—তা হলে তুমি বলছ আমি আর কোনোদিনই ইস্কুলে ভর্তি হব না। এভাবে ঘরে বসে থাকব।

—হুঁ, এখন দিন কতক তাই থাকতে হবে, ওই পুরোনো 'বই-টই' যা আছে সেগুলো ঘরে বসে পড়লেই চলবে। এখন আমি তোমাকে কিছুতেই ইস্কুলে ভর্তি করাব না সোনা। নতুন জায়গা। কেমন সব ছেলেপিলে কে জানে।

—তোমার যে কী ভয় না! কলকাতা ছেড়ে এলে ভয়ে, এখানে এসেও সেই ভয়। দড়ি থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে পুলক স্নান করতে চলল। চৌকাঠের কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াল। এবার

বাবার দিকে চোখ ঘুরিয়ে ফিক করে হাসল। বলল, বেশ তো আমার যদি লেখাপড়া না করলে চলে, চাকরি বিষয় না করলে চলে, তুমি যদি বুড়ো বয়সেও আমায় বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পার মন্দ কি। আমি বসে বসেই খাব।

—হুঁ, তাই খাবি, তোকে চাকরি করে আমায় খাওয়াতে হবে না, এখন ছুট করে একটা ডুব দিয়ে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে নে। আমি বিশ্রাম করি। একটা বেজে গেছে।

—তুমি খেয়ে শুয়ে পড়, আমার জন্য বসে থাকতে হবে না। আমি ভাত নিয়ে খুব খেতে পারব।

—হ্যাঁ সাংঘাতিক করিৎকর্মা ছেলে কি না তুমি আমার। নিজের হাতে ভাত বেড়ে নিয়ে খাবে, তবেই হয়েছে, এটা ফেলবে ওটা ছড়াবে, বলে কি না এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে শিখল না যে ছেলে……

কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে এসব বলা হচ্ছে সে আর ঘরে নেই। হরিহর চোখ তুলে দেখল পুলক ততক্ষণে গামছাটা কোমরে জড়িয়ে হনহন করে পুকুরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। একটু সময় চুপ করে থেকে হরিহর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ল। এখনো তোমার ভয় কাটছে না বাবা। কী করে কাটবে। হরিহর মনে মনে বলল, আমি যে ঘরপোড়া গরু রে বাবা, সিঁদুরে মেঘ দেখলে বুক কাঁপে।

॥ ৪ ॥

এখন আশ্বিন মাস। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের ফাঁকে আকাশটা এমন ভীষণ নীল দেখায় না! জানালায় চোখ রেখে পুলক তাই দেখছে। দুপুরে ভাত খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

তাদের দেড় কামরা ঘরের একটা শোবার জন্য। রাত্রে বাবা ও সে শোয়। আর এই আধখানা কামরাকে দু ভাগে ভাগ করে

একদিকটা ভাঁড়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, আর জানালা ঘেঁষে এ-পাশটায় পুলক তার লেখাপড়ার জায়গা ঠিক করে নিয়েছে। একটা ভাঙ্গা ছোট তক্তপোষ উমার মা'র কাছ থেকে চেয়ে এনে এখানে বিছিয়েছে পুলক। ভাঙ্গা পায়াটা দুখানা ইঁটে ঠেকা দিয়ে মোটামুটি সোজা করে নিয়েছে। উমারা এটা ব্যবহার করত না। তাদের বারান্দার এক ধারে কাত হয়ে পড়েছিল। জিনিসটার এবার সদ্ব্যবহার হল দেখে উমার মা ভারি খুশি।

পড়ার ঘরে পুলকের বসবার এমন কি শোবার ব্যবস্থাও হয়ে গেল—এখন একটা টেবিলের দরকার। পুলকদের একটা তক্তপোষ এবং একটাই টেবিল ছিল। কলকাতা থেকে যে দুটো আনা হয়েছে—ঐ দুটোই এখানে বড় ঘরে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ছোট ঘরে পুলকের বই খাতাপত্র কি করে রাখা যায়।

উমার মা তারও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিজের ঘর থেকে একটা পুরানো কেরাসিন কাঠের বাক্স এনে চার ইঁটের ওপর দাঁড় করিয়ে চমৎকার টেবিল করে দিয়েছে পুলকের জন্য।

তাই বলা হচ্ছিল, আমাদের জন্য অশ্বিনী ভদ্রের স্ত্রী যা করছে না। এই জন্মে মহিলার ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না। উঠতে বসতে হরিহর ছেলেকে বোঝায়।

ভারি তো একটা কেরাসিন কাঠের বাক্স। আর একটা পায়া-ভাঙ্গা নড়বড়ে তক্তপোষ। নামেই তক্তপোষ। ফেলে দিচ্ছিল কি পুড়িয়ে উনুন ধরাত একদিন—ঘরে রাখার জায়গা নেই, তাই আমাদের দিয়েছে।

বাবার মুখের ওপর কথাটা বলতে পারে না পুলক। মনে মনে বলে।

না, এই মহিলার ওপর পুলক খুব একটা খুশি নয়। তার বাবার অসুখ বিসুখ হলে মাঝে মধ্যে ভাত টাতটা রেঁধে দিচ্ছে—এটা যদিও একটা উপকারই করছে, পুলক অস্বীকার করে না, কিন্তু

তাই বলে যখন তখন তাদের ঘরে ঢুকে, জিনিসপত্র গোছান ঝাড়পোছ করা, এটা টেনে দেওয়া ওটা সরিয়ে রাখা। কেমন যেন লাগে পুলকের।

কেবল কি এই, এবেলা কি রান্না হল পুলকের বাবা, ওবেলা কী রান্না হবে পুলককে কি দোকানে পাঠিয়েছিলেন, আপনার হ্যারিকেনের যে কেরাসিন ফুরিয়ে গেল—ইত্যাদি খোঁজ খবর নিতেও যে মহিলা কতবার পুলকদের দরজায় এসে দাঁড়াচ্ছে।

নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাধারণ আয়নার মতন তকতক ঝকঝক করছে ওঁদের ঘর দুয়ার। কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা খুব পছন্দ করেন তিনি। হরিহর ছেলেকে বোঝায়। তুই এক আঁতুড়, আমি এক আঁতুড়, আমাদের ঘর দুয়ার নোংরা চেহারা উমার মার সহ্য হয় না। শুনে পুলক চুপ করে থাকে।

চুপ করে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারে সে। বাবার বয়েস হয়েছে। উমার মাও কিছু ছোট না। বরং উমা যদি এটা ওটা করতে তাদের ঘরে বার বার আসে, সেটা যেন কেমন মানিয়ে যায়। যেন পুলকদের ঘরের একটি মেয়ে, যেন পুলকের একটি বোন।

পুলকের বোন নেই। ভিতরে ভিতরে তার কত আফসোস।

কিন্তু উমা খুব একটা আসছে না তাদের ঘরে। ওর অবশ্য পড়াশুনো আছে। এদিকেই কোথায় যেন একটা স্কুলে পড়ে। নাইন ক্লাসে পড়ে। বোজ সবুজ পাড়ের শাড়ি পরে স্কুলে যেতে হয় ওকে। ওদের স্কুলের সব মেয়েকেই নাকি ওই রঙের শাড়ি পরতে হয়, যারা ফ্রক পরে যায় তাদের ফ্রকেরও এই এক রং।

কলকাতার মেয়ে স্কুলগুলির মতন এসব ছোট জায়গার স্কুলগুলিতেও পোশাকের নিয়ম টিয়মের ঢেউ এসেছে দেখে পুলকের এত হাসি পায়।

পুলকের যদি ছোট একটা বোন থাকত নিশ্চয় তাকে এই নিয়ে

ভীষণ টিটকিরি দিত সে। সেই সুযোগ সে পায়নি। তাই এখানে এসে একদিন কথায় কথায় উমাকে এক রঙের শাড়ি এক রঙের ফ্রক পরে স্কুলে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করেছিল। মনে হয় যেন তোমরা বনের পাখি। একরকম রঙ গায়ে না থাকলে কে কোথায় হারিয়ে যাবে, একটি আর একটিকে খুঁজে পাবে না।

শুনে উমা রাগ করেনি। হেসেছিল। ভীষণ বুদ্ধিমতী। হেসে সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জবাব দিয়েছিল। হুঁ, সৈন্যদের মতন এক রকম পোশাক পরে আমাদের ইস্কুলে যেতে হয়।

শুনে পুলক কিছু চুপ থাকেনি। মনে হয় তোমরা বুঝি লড়াই করবে কারো সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল।

হুঁ, ছেলেদের সঙ্গে, তোমরা আজকালকের ছেলেরা ভীষণ দুষ্ট কিনা। উমা বলেছিল।

ঝপ করে কলকাতার কথা মনে পড়ে যায় পুলকের তখন। তাদের গলি দিয়ে মেয়েরা যখন স্কুলেটুলে গেছে পিছন থেকে ছেলেরা শিস দিয়েছে গলা খাঁকার দিয়েছে, মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে সব কথা বলেছে।

সব ছেলে না, কিছু কিছু ছেলে। রোজই তারা এরকম করত। পুলকও হয়তো তখন স্কুলে যাচ্ছে। এসব দেখে শুনে পুলকের এত রাগ পেত। অসভ্য ছেলেগুলিকে কি কেউ শায়েস্তা করতে পারে না। ভাবত সে। প্রায়ই ভাবত। পুলকের চেয়ে তারা বয়সে বড়, একা পুলক তাদের সঙ্গে পারবে কেন। একদিন ঈশ্বর তার মনের ইচ্ছাটা পূরণ করল। তার দাদা পিনাকী ও পিনাকীর দুটি বন্ধু কটা ছেলেকে ধরে এমন মার লাগিয়েছিল না। তারপর থেকে মেয়েদের দেখে তারা আর কোনোদিন শিস দিত না গলা খাঁকার দিতনা বা নোংরা কথা বলত না। তাদের তিনকড়ি কবিরাজ লেনটা দারুণ ভাল হয়ে গিয়েছিল। অন্য সব রাস্তায় গলিতে এসব নোংরামী চলছিল ঠিকই, কিন্তু পুলকদের পাড়ায় এই জিনিস

একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুলকের দাদা পিনাকী ও পিনাকীর দুটি বন্ধুর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল সেদিন।

আজ হয়তো সেই অসভ্য ছেলেগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজ তাদের শায়েস্তা করার কেউ নেই। পিনাকী নেই। পিনাকীর বন্ধুরাও কোথায় চলে গেছে। দাদা মরে যাবার পর পুলক আব তাদের একদিনও তিনকড়ি কবিরাজ লেনে দেখেনি। সম্ভবত তারা অন্যও কোথাও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলক কার কাছে যেন শুনেছিল তার দাদাব বন্ধু অরুণ ও হাবুলকে পুলিশ খুজছে।

এখানে এসে পুলক এক এক কবে তার দাদার সব কথাই উমাকে বলেছে।

তার পর সেদিন মেয়েদের পিছনে লেগে থাকা অসভ্য ছেলেদের কথ উঠতে পুলক তাদের তিনকড়ি কবিরাজ লেনের ঘটনাটার কথাও উমাকে শোনায়।

শুনে উমা কতক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বলেছিল, যদি সব ছেলেই তোমার দাদার মতন ভাল হত তবে তো কথাই ছিল না।

তা কি আর হয়। পুলক বলেছিল, সব ছেলেই কিছু একরকম হয় না। আমার কথাই ধর না। আমি কি দাদার মতন হতে পেরেছি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। উমা ফিক্ করে হেসেছিল, সারাদিন মাঠে ঘাটে ঘুরে তুমি কেবল পাখি দেখছ।

হু, পাখি দেখছি, আর ঘরে এসে একটা দুটো কবিতা লিখছি।

শুনে উমার চোখ দুটো গোল হয়ে গিয়েছিল। তুমি কবিতা লেখ?

ঐ আর কি, একটু আধটু চেষ্টা করছি।

আমায় নিয়ে একটা লিখে ফেল না।

চেষ্টা করব। একটু চুপ করে থেকে পুলক আবার বলেছিল, হয়তো একদিন তোমায় নিয়ে একটা ছোটখাট কবিতা লিখে

তোমাকে দেখাতেও পারি কিন্তু যদি বলো যে ইস্কুলে যাবার পথে তোমার ও তোমার বান্ধবীদের পেছনে যেসব পাজি দুষ্টু ছেলে লেগে থেকে যন্ত্রণা করে তাদের শায়েস্তা করতে, তবেই আমার হয়েছে আর কি।

না তা কি করে আর হবে। উমা তখন আর হাসছিল না। তুমি অন্যরকম। তোমার দাদার সাহস তোমার নেই। তুমি ভীরু।

কথাটা শুনে হঠাৎ বুকের ভিতর কেমন ধক্ করে উঠেছিল পুলকের। দাদার মতন সাহস তার নেই। কেবল জঙ্গলে ঘুরে পাখি দেখতে জানে সে। আর লুকিয়ে একটা দুটো কবিতা লিখতে।

উমা তার সমান না হলেও দু'এক বছরের ছোট। ঠিক এই বয়সের মেয়েদের কাছে ছেলেরা নিজেদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে ভালবাসে। আর এই মেয়েটি কিনা চোখ বুঁজে তাকে ভীরু বলে ফেলল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল পুলকের। তবে তার দাদার প্রশংসা করল বলে এর ওপর খুব একটা রাগ করতেও সে পারছিল না। বরং বলতে গেলে একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে পুলক পাশের ঘরের উমাকে নিয়ে।

মেয়েটাকে ভালবাসবে, না কি রাগ করে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

এক বাড়িতে বাস করে খুব একটা দূরেও থাকা চলে না। উঠতে বসতে দেখা হয়। মাঝে মাঝে এটা ওটা গুছিয়ে দিতে তাদের ঘরেও ঢুকছে। অর্থাৎ উমার মা যখন সময় পায় না। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে তখন উমাকে পাঠাচ্ছে এঘরে।

কাঠ কাটতে গিয়ে পরশু সন্ধ্যেবেলা হরিহরের আঙ্গুলে চোট লেগেছিল। উমার মা তখন ঠাকুর ঘরে আহ্নিক করছে। হরিহরকে সরিয়ে দিয়ে উমা নিজের হাতে পুলকদের উননটা ধরিয়ে দেয়।

জঙ্গলে ঘোরাঘুরি শেষ করে পুলক সবে তখন বাড়ি ফিরেছে।

হরিহর ছেলেকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে দাঁত খিঁচোনি দিতে আরাম্ভ করে ছ এখন কর্তার সময় হল ঘরে ফেরার, রত্তিরে পিণ্ডি গিলতে হবে যে, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, আমার চোখের ওপর থেকে—অ্যাঁ, কুটোটি নাড়ান যায় না, এমন ছেলে দিয়ে আমি করব কি, এব চেয়ে খানিকটা করে ফেনভুষি, খাইয়ে একটা ছাগল গরু পুষলে আ৺াব যথেষ্ট লাভ হত।

হরিহর ছেলেকে গালাগালি দিচ্ছিল আর ভেজা ন্যাতা জড়ান চোট লাগা আঙুলটা মুখের কাছে তুলে ফুঁ দিচ্ছিল।

তখন আকাশে সপ্তমীর চাঁদ উঠেছে। খৈ ফুলের মতন পাতলা ফিনফিনে জ্যোৎস্না পুলকদের উঠোনটায় ছড়িয়ে আছে। লাল টকটকে রবীন বাঁধা ডবল বেণী পিঠে ঝুলিয়ে উমা উঠোনের এক পাশে বসে উনুনে আগুন দিচ্ছে। পবনে বেগুনি শাড়ি, শাড়ির তলা দিয়ে পায়ের কাছে সাদা ফুলের মতন কুচি দেওয়াব সায়ার লেস উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। এই বয়সে কলকাতার বেশিব ভাগ মেয়ে ফ্রক পরে। তাই শাড়ি পরা উমাক দারুণ সুন্দর লাগছিল পুলকের চোখে।

বাবা বকুনি দিচ্ছে, কিন্তু তাব চোখ উঠোনের ওধারটায়।

যেন বাবাব বকুনি মোটেই তার কানে ঢুকছে না।

ঘাড় ঘুরিয়ে, হরিহর দেখতে না পায়, হাঁটুব সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে পুলকের দিকে চোখ বেখে উমা ঠোঁট টিপে হাসছে।

ফলে পুলকের মাথা গরম হয়ে উঠল। যেন বাবার কাছে সে গালি খাচ্ছে, আর তাই উপভোগ করছে পাশের ঘবের মেয়ে।

অথচ তার চোখে নেশার মতন লাগছিল বেগুনি শাড়ি, লাল ফিতে বাঁধা বেণী, পায়ের কাছের সাদা সাদা ফুলের সায়ার লেস, আর উঠোনময় খৈ ফুলেব মতন ফিনফিনে জ্যোৎস্না।

তার ইচ্ছে করছিল তখনি ছুটে গিয়ে বেণী ধবে টেনে মেয়েটাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দেয়।

আবার সেই সঙ্গে ইচ্ছে করছিল, ওই মেয়েকে পাশে বসিয়ে গল্প

করে, গল্প করতে করতে ওর কালো চকচকে ডাগর 'চোখ দুটো দেখে আর তাই দেখতে দেখতে চটকরে একটা কবিতা ভেবে নেয়, রাত্তিরে শোবার আগে সেটা চুপি চুপি লিখে ফেলবে।

অর্থাৎ দুটো জিনিস পুলকের মনে এক সঙ্গে খেলা করছিল। আর একদিনের মতন। যেদিন তাকে ভিরু বলেছিল ঐ মেয়ে। অথচ তার দাদার প্রশংসা করছিল।

চটবার মতন ঘেন্না লাগার মতন একটা কিছু, আবার ভাল লাগার মতন অনেক কিছু।

পরশু সন্ধ্যেবেলা আবার সেই জিনিস। অর্থাৎ দুটো ভাবনা এক সঙ্গে পুলকের মগজের মধ্যে ঢুকে খেলা করতে লাগল।

ভাল লাগা এবং শুধু ভাল না লাগা নয়, রীতিমত ঘেন্না করা, হিংসে করা, ঈর্ষে করা।

তাদের উপকার করতে এসেছে ঠিকই। হয়তো বাবার থেতলান আঙ্গুলটায় নিজের হাতেই জল ন্যাতা বেঁধে দিয়েছে, এখন উনুন ধরাচ্ছে। এদিকে পুলক গাল খাচ্ছে দেখে টিপে টিপে খুব হাসছে।

উনি শিখেছেন কেবল থালা থালা ভাত খেতে, আর ষাঁড়ের মতন চরে বেড়াতে। বাবার গলা বন্ধ হচ্ছিল না। একটু পরে আহ্নিক সেরে উমার মা বেরিয়ে এসে উঠোনে দাঁড়ায়।

আহা, এই ভর সন্ধ্যেয় এত বকছেন কেন ছেলেকে, আপনাকে রোজ বলি, পুরুষের জাত, ও কি ঘরের কোণায় সারাক্ষণ নিজেকে আটকে রাখতে পারে। তায় আবার ছেলেমানুষ এই বয়সেই তো বাইরে বাইরে ঘুরবে, এখনি কি ঘর গেরস্থালীর কাজে মন বসবে। শুনে হরিহর হঠাৎ চুপ করে থাকে। উমা আর এদিকে একবারও তাকায় না। যেন ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে, মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

তুই যা, তোর আবার কালকের ইস্কুলের অনেক পড়াটড়া—

আমি দেখছি। এখনি আঁচ উঠবে, পুলকের বাবা, কী রান্না হবে!

না না, আপনি কেন, ছি, আপনাকে কিছু করতে হবে না, আমরা প্লিপ্তি গিলব আর রোজ আপনি এসে কষ্ট করে—

আহা, তাতে কি, উমার মা হাসছিল। আমার একটুও কষ্ট হবে না, আমার হাতে বাত নামেনি।

না না, উমার মা, আমায় এভাবে লজ্জা দেবেন না। হরিহর মাথা নাড়ছিল। ষাঁড়টা এসে গেছে, ওটাকে দিয়ে সব করাব, আপনি ছেড়ে দিন। আপনি ঘরে যান।

কিন্তু উমার মা ততক্ষণে তোলা উনুনটা হাতে ঝুলিয়ে পুলকদের রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে।

হরিহর তখন একেবারে চুপ। এবং পুলকের চোখের সামনে দিয়ে লাল ফিতে বাঁধা বেণীটা দোলাতে দোলাতে আর এক জন উঠোনটা পার হয়ে অন্য দিকে সরে গেল।

পুলকের মনে হচ্ছিল হঠাৎ তার বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

কেন, এখনি আহ্নিক সেরে মহিলার এখানে ছুটে আসার এমন কি দরকার ছিল। মেয়ের ইস্কুলের পড়া। মেয়েকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ঠিক পুলকদের রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করার নামে পুলকের বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। যেন আর একটু সময় উমা এখানে থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হত। ইস্কুলের পড়া ইস্কুলের পড়া। যেন পুলক কোনোদিন স্কুলে পড়েনি।

পুলকের ইচ্ছে করছিল তখনি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুকুর পাড়ে, যেটা তার সব চেয়ে প্রিয় জায়গা হরিতকী গাছটার নীচে বসে থাকে। তখন অবশ্য রাত হয়ে গেছে। পাখি টাখি চোখে পড়বে না। না-ই পড়ল। পাখির ডানার ঝাপটা শুনবে আর ওপরের দিকে চোখ তুলে দিয়ে হরিতকী পাতার ফাঁক দিয়ে সরু ছিমছাম চাঁদটাকে দেখবে। পাতার ফাঁক দিয়ে আশ্বিনের

নতুন জ্যোৎস্না চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে ঝরে পড়বে।

এখন বাড়িতে থেকে লাভ কি। পুলক একলা উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। একজন রান্না করছে, আর একজন রান্নাঘরের ঠিক দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বকবক করছে। যা দিন কাল, বাজারের সব জিনিসের দাম চড়চড় করে বাড়তে বাড়তে আকাশে গিয়ে ঠেকছে উমার মা, আমাদের গরীবদের আর বেঁচে থাকতে দেবে না ভগবান।

যা বলেছেন পুলকের বাবা, আমি তো চোখে মুখে পথ দেখছিনা। কি করে যে কি হবে, অসময়ে উনি চলে গেলেন—

এ রকম কথা, এক ঘেয়ে আলাপ। কিন্তু ওই বয়স্ক মানুষ দুটির কাছে যেন খুবই নতুন জিনিস এসব। যেন দুজনের আজ প্রথম দেখা। কথা বলে বলে কথা আর শেষ হয় না। আর দাঁড়ায়নি পুলক। নিজের ছোট ঘরটায় ঢুকে হ্যারিকেনটা জ্বেলে কবিতার খাতাটা টেনে নিয়ে বসেছিল। কিছুই কিন্তু মাথায় আসছিল না। কেবল জ্যোৎস্না আর অন্ধকারে মেশান একটু আগের উঠোনের ছবিটা চোখের সামনে ভাসছিল। একজন তাকে দেখে ঠোঁট টিপে হাসছে। দেখে পুলক ভিতরে ভিতরে ভীষণ চটে যাচ্ছে। অথচ কী যেন একটা অদ্ভুত সুন্দর জিনিসের দিকে সে তাকিয়ে, অন্য কোনোদিকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

না, কলকাতা শহরে উমার মতন কোনো মেয়েকে সে দেখেনি। মেয়ে কি আর দেখত না। হাজার গণ্ডা মেয়ে তিনকড়ি কবিরাজ লেন ধরে স্কুলে গেছে, কলেজে গেছে, চাকরি করতে গেছে। ছোট বড়, আর একটু বড়—কত মেয়ে! তারপর তাদের নলিনী সরকার স্ট্রীটে। স্কুলে যাবার সময়, ছুটির পর, স্কুল থেকে বেরিয়ে। এভাবে ট্রামে বাসে পার্কে এই ফুটপাথে সেই ফুটপাথেও অন্যান্য মেয়ে রোজ তার চোখে পড়ত।

ঐ চোখে পড়াই।

পুলকের মনেই পড়ে না কোনো মেয়ের দিকে সে ভাল করে একদিন তাকিয়েছে।

যেমন রাস্তার ছুপাশের ঘরবাড়ি দোকানপাট, লাইট পোষ্ট, ফুটপাতের ফেরিওয়ালা, রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটে চলা বাস ট্রাম ট্যাক্সি রিকসা লরি ঠেলা কি কোথাও একটা ট্রামের ছেঁড়া তার বা কারো বাড়ির ছাদ, কি রাস্তার পাশের লেটার বক্স, বা কোনো গাছের মাথায় আটকানো একটা ছেঁড়া ঘুড়ি দেখত তেমনি একটি মেয়েকেও সে দেখত।

সেই দেখার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু থাকত না। অর্থাৎ তার চোখে পড়ত, বাস্, ঐ পর্যন্ত।

কিন্তু কোনো মেয়েকে নিয়ে ভাবা। পুলক কল্পনাই করতে পারত না সেদিন।

তা-ও আবার কেমন মেয়ে? যাকে দেখলে ভীষণ রাগ হয়, আবার না দেখলেও মনে হয় বুকের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। কাজেই অদ্ভুত লাগছে এ বাড়ির এই উমাকে।

হুঁ, যা বলা হচ্ছিল। আশ্বিনের সুন্দর মাজাঘসা-ছুপর, হলদে রোদ ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আয়নার মতন চকচকে নীল আকাশ, আকাশে চিল ডাকছে।

বাইরে না গরম না ঠাণ্ডা চমৎকার ফুরফুরে বাতাস, ভাত খেয়ে উঠে একটু যেন ঝিমোনি এসেছে পুলকের, আর একটু হলেই তার ছুচোখ প্রায় বুজে যায়, আর জানালার কাছে আচমকা একটা হলুদ রঙ খেলা করে উঠল।

কবিতার খাতাটা বুকের কাছে, পায়া ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর পুরোনো খবর কাগজ বিছিয়ে বিছানা করা হয়েছে। তার ওপর

পুলক শুয়ে, পরনে লুঙ্গির মতন করে পরা হরিহরের একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড়, দুটো পায়জামাই জলকাচ করে আজ সে ধুয়ে দিয়েছে। তাতে যদি একটু পরিষ্কার দেখায়। ছোট ঘরের একদিকে ভাঁড়ার, গুমোটের মতন লাগছিল। একটু একটু ঘামছে পুলক।

হঠাৎ চোখের সামনে চকচকে হলদে রঙ দেখে তার চোখাদুটো গোল হয়ে গেল। উমা। হলদে ব্লাউজ হলদে শাড়ি।

—কি করছ? আজ আবার টিপে টিপে হাসছে উমা।

—কিছু না। শুয়ে আছি। পুলকের চোখে পলক পড়ছে না।

—তুমি ভীষণ অলস। উমা বলল।

পুলক গম্ভীর হয়ে যায়।

—কথা বলছ না কেন।

—আমি অলস, আমি ভীরু।

—আহা, ঠাট্টা করে কিছু বলেছি কি অমনি রেগে গেলেন বাবু।

—ঠাট্টা করে বলছ কি সিরিয়াসলী বলছ কি করে বুঝব? এবার পুলকের মুখে সামান্য হাসি দেখা দিল।

খাটিয়া ছেড়ে উঠে বসল।

—ইস্। ভীষণ ঘামছ।

হুঁ, বাইরে ফুরফুরে হাওয়া, ভেতরে বিচ্ছিরি গুমোট। হেসে পুলক নিজের খোলা শরীরটার দিকে তাকায়। তারপর চোখ তুলে দেখে টলটল করে উমা এদিকে তাকিয়ে তার পরনের কাপড়টা দেখছে, কোমর দেখছে, খোলা বুকটা দেখছে।

আমাকে দেখছ তুমি, কাজেই আমিও তোমাকে দেখব। ভেবে নিজের মনে হাসল পুলক, তারপর পাল্টা দেখাদেখির পালা চলল কতক্ষণ। পুলকও ফ্যালফ্যাল করে উমার থুতনি, গলা, বুক, দুটো নধর ফরসা হাত ও ব্লাউজের হাতায় কাজ করা সুন্দর প্রজাপতিটা দেখতে লাগল। একটু সময় তারা কেউ কথা বলল না।

—মাসিমা ঘুমোচ্ছেন? পুলক প্রশ্ন করল।

—হু। উমা এদিক ওদিক তাকায়। মেশোমশায় ঘুমুচ্ছেন?

—হু। পুলক মাথা ঝাঁকাল।

উমা কথা না বলে ভোমরার মতন কালো চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার পুলকের উদোম শরীরটা দেখে। তারপর ফিক করে হাসে।

—লুঙ্গি পরেছ।

—কি করব। দুটো পাজামা ধুয়ে দিয়েছি।

—লুঙ্গী পরলে কেমন বুড়ো বুড়ো দেখায় ছেলেদের।

—তাই নাকি! পুলক ঠোঁট বেঁকায়। যেমন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরলে অল্প বয়সের মেয়েদের বুড়ি বুড়ি দেখায় তাই না?

—আমার বয়স মোটেই অল্প না। উমা হঠাৎ চোখ ট্যারা করে নিজের পরনের শাড়িটা দেখে।

—আমিও কিছু অল্প বয়সের ছেলে নই। চোখ নামিয়ে পুলক তার পরনের লুঙ্গিটা দেখে।

তারপর তারা চোখ তুলে এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় হাসতে থাকে। অর্থাৎ যেন একটা ঝগড়া বেধে প্রায় উঠেছিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। দুজনেই আবার বন্ধু।

—আজ পনেরো আগস্টের ছুটি। ইস্কুলে না গিয়ে খুব সেজেগুজে বেড়াচ্ছ। জানালার কাছে পুলক গলাটা বাড়িয়ে দিল।

—আহা, কী আর এমন সেজেছি। আবার চোখ ট্যারা উমা পরনের টকটকে হলদে শাড়িটা দেখে, হলদে ব্লাউজের হাতায় নীল প্রজাপতিটা দেখে।

—কপালে টিপ, চোখে কাজল। পুলক বিড়বিড় করে বলল।

উমা হঠাৎ কিছু বলল না। ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনের অপরাজিতা ঝোপটা দেখে।

—ভেতরে এসো না! পুলক আস্তে ডাকল।

—না। উমা ঘাড় দোলাল। তোমার সঙ্গে আড়ি।

—কেন। পুলক না বোলে পারল না। আমি কী দোষ করেছি শুনি?

—আমায় নিয়ে কবিতা লিখবে বলেছিলে। কৈ, লিখলে না তো।

—ধেৎ, আমি কি সত্যি কিছু কবিতা লিখতে পারি, এমনি বলেছিলাম।

—উ হু, এমনি কেন, ঐ তো একটা খাতা দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ওটা তোমার কবিতার খাতা।

যেন ধরা পড়ে গিয়ে পুলক লজ্জা পেল। ঘাড় ফিরিয়ে তক্ত-পোষের ওপর ফেলে রাখা খোলা খাতাটা দেখল। তারপর ঠোঁট বেঁকাল।

—ঐ একটু আধটু চেষ্টা করছি আর কি, বাবা ইস্কুলে ভর্তি করাতে চাইছে না, এখন আমাকে, ইস্কুলের কথা বললেই বাবা মন খারাপ করে।

—কেন! উমা অবাক। তাই তুমি সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরে পাখি টাখি দেখছ।

পুলক হেসে ঘাড় কাত করল।

—পাখিটাখি দেখছি আর দু একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করছি। বাবা বলে কিনা ইস্কুলে ভর্তি না হলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হবে না! তোদের রবি ঠাকুর ইস্কুলে না পড়েই কতবড় কবি, কেমন জ্ঞানী গুণী মানুষ হতে পেরেছিলেন।

পুলকের কথা বলার ধরন দেখে উমা কুলকুল করে হাসতে লাগল। অবশ্য খুবই চাপা গলায় হাসছিল। কি জানি যদি মা জেগে যায়। পুলকের বাবার ঘুম ভাঙলেও অসুবিধে আছে। তারা দুজনে নিরিবিলি এখন যেমন প্রাণ খুলে কথা বলছে সেটি আর পারবে না।

—আসল কথা কি জান, বাবার কেবল ভয় ইস্কুলের ছেলেদের

সঙ্গে মেলামেশা করলে আমি নষ্ট হয়ে যাব।

—অ মা, সে আবার কি কথা! উমা এবার আরও বেশি অবাক হয়। ইস্কুলে পড়লে কি ছেলেরা নষ্ট হয়ে যায়।

—মানে দাদার মতন আমি যদি এই ছেলে সেই ছেলে সঙ্গে মিশে রাজনীতি টিতি করতে শুরু করি।

—ওটাকে কি নষ্ট হওয়া বলে। উমা না বলে পারল না।

—বাবা তাই বলে। রাজনীতি করে দাদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অকালে প্রাণটা হারাল।

—কিছুক্ষণ দু'জনে কথা বলল না।

একটা পাখি কিচকিচ করে মাথার ওপর ডাকছিল।

—এসো, ভেতরে এসো। পুলক আবার ডাকল। দুপুরে কোনোদিন তুমি বাড়ি থাকনা, আজ তোমার ছুটি, তবে না একটু গল্প করতে পারছি।

—আমার সঙ্গে গল্প করতে বুঝি তোমার ভাল লাগে? উমা বেঁকিয়ে হাসল।

—লাগে বৈকি। এখানে কারো সঙ্গে মিশতে পারছি না নতুন জায়গা। তবু বাড়িতে তুমি আছ দুটো একটা কথা বলতে পারি।

হঠাৎ উমা চুপ করে থাকে।

—কি হল। পুলক ভুরু কুঁচকোয়।

মনে হয় মা জেগে গেছে। যেন একটা কাশির শব্দ শুনলাম।

উমার মতন পুলকও কানটা খাড়া করে ধরল।

উমার মাথার ওপর গাছের ডালে পাখিটা এবার বেশ জোরে কিচমিচ করতে থাকে। আর কোনো শব্দ শোনা যায় না বাড়ির ভিতর। উমা এবার জানালার গরাদে হাত রাখে। ফরসা ঝকঝকে আঙুল। ফুলের পাপড়ির মতন মনে হয় পুলকের। আঙুলগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল সে।

—মনে হয় খুব যেন কিছু ভাবছ? উমা ফিসফিসিয়ে বলে।

—আমার মনে হয় আমার সঙ্গে তুমি বেশি মেলামেশা করলে, কথা-টথা বললে তোমার মা রাগ করে। মুখটা কালো করে পুলক বলল।

--ধ্যেৎ, তা কেন হবে। ইস্কুলের পড়া-টড়া ভাল লেখা হবে না মার কেবল এই ভয়।

যেন পুলক কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না।

ফুলের পাপড়ির মতন উমার আঙ্গুলগুলি না দেখে সে উমার মাথার পিছনে অপরাজিতা ঝোপটার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। তার চোখ মুখের অবস্থা দেখে উমাও ভয় পেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় ফেরাল। ভয়ে সে তখন কাঠ।

মানকচু ঝোপটার কাছে সুধারাণী দাঁড়িয়ে। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা ফোলা ফোলা চোখ। মাথায় কাপড় নেই। যেন মাথার ভেজা চুল হাওয়ায় শুকোবে বলে সবটা চুল পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। দু'হাত কোমরে রেখে ফ্যালফ্যাল করে এদিকে তাকিয়ে আছে।

পা পা করে উমা মার কাছে সরে গেল।

—কি হচ্ছিল ওখানে? সুধারাণী চোখ বড় করে মেয়ের মুখ দেখে।

—একটা গল্পের বই চাইতে গিয়েছিলাম পুলকের কাছে।

—ওর কাছে আবার কিসের গল্পের বই। ও তো ইস্কুলে-টিস্কুলে পড়ে না। পড়ার বইটইও তেমন কিছু আনেনি। খরচ চালাতে পারেনা বলে বাবা কবেই ইস্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছে। ওই ছেলে গল্পের বই পাবে কোথায়।

উমা পর পর দুটো ঢোক গিলল। চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটতে লাগল।

—তোমার ইস্কুলের কত পড়া। পাঠ্যবই পড়ে কুল পাওনা। কত লম্বা কোর্স। সেসব ফেলে রেখে ভর দুপুরে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে ওই ছোঁড়ার কাছে গল্পের বই চাইতে এসেছ— কী আক্কেল তোমার।

উমা আর ঘাড় তুলতে পারছে না। কেননা সুধারাণী বেশ জোরে জোরে কথাগুলি বলছিল। পুলক কান পেতে শুনছে। বুঝতে পেরে উমা বোধহয় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

খোলা খাতাটা একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পুলক লম্বা হয়ে তক্তপোষের পর শুয়ে পড়ল।

॥ ৫ ॥

অনেকদিন পর পাশের ঘরে ভাড়াটে কুলদা গুপ্ত কথা বলছে।

বুঝেছেন দাদা। এবার আর ভাত খেতে হবে না। চালের দর ডালের দর তেলের দর মাছের দর—যেদিকে হাত বাড়াবেন মাথা ঘুরে যাবে।

—ডালের দর আবার চড়ল নাকি। হরিহর দত্তর চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। কাল তো শুনেছিলাম মুসুর দু'টাকা চার আনায় উঠেছে।

—আজ আড়াই টাকা হাঁকছে পরেশ মুদী।

—এঁ্যা! অতি কষ্টে একটা ঢোক গিলল হরিহর। মাছের বাজারে আগুন। সব্জির বাজারে আগুন। বললেই ওরা বলে খরায় কিছু হয়নি কত্তা। এখন ডালটাও যদি—

—তাই বলছি দাদা, তবু আমরা চাকরি করছি। মাসের শেষ কম হোক বেশি হোক কিছুটা পকেটে আসে, এখনো দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন দিকিনি কত বেকার কত গরীব চাষী মজুর দেশ জুড়ে, তারা বাঁচে কি করে আর এমনটা চলতে থাকলে আমাদেরও যে আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে না তাই বা কে বলবে।

হরিহর হঠাৎ কথা বলতে পারছিল না। যেন গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলল, আপনাদের

রেলের চাকরি গুপ্ত মশাই, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী, আপনারা যদি একথা বলেন, আমরা বাকি মানুষ বাঁচি কি করে।

—সব মরবে, সব মরবে, আমি আপনি রাম শ্যাম যদু মধু কেউ বাঁচবে না।

—একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যায় না কেন, একটা ওলট পালট না হওয়া তক দেশের অবস্থা কোনোদিন থামবে বলে তো আমার মনে হয় না। উঠোনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে হরিহর বলছিল।

উমাদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উমার মা শুনছিল। উমার মাও আর চুপ থাকতে পারল না।

—রাতারাতি কাণ্ডটা কে ঘটাবে গো দত্তমশাই। আমরা যে সব ভেড়ার দল। উপোস থেকে থেকে মরব তবু টুঁ শব্দটি মুখ থেকে বেরোবে না।

—হুঁ যা বলেছেন, আমরা ভেড়ার দল কাপুরুষের দল। কুলদা গুপ্ত হাত নেড়ে বলল, এখন দরকার কিছু ইয়াংম্যানের, আমাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আমাদের দিয়ে কিছুই হবে না। এখন দরকার কিছু সাহসী যুবকের দোকানে দোকানে গিয়ে তারা হানা দেবে, জিনিসপত্রের দাম কমাও বলে দোকানীদের শক্ত চাপ দিতে হবে, মজুতদার আড়তদারের গোলা চড়াও করে ধান চাল তেল ডাল লুঠ করে এনে গরিবদের যোগাতে হবে। হুঁ এর জন্য অনেক রক্ত ঝরবে, অনেক গুলি-গোলা ছুটবে—কিন্তু রক্ত না দিলে বিপ্লব না করলে কোন্ দেশের উন্নতি হয়েছে বলুন উমার মা। আপনি কি বলেন দত্তমশাই।

দত্ত মশাই, পুলকের বাবা হরিহর কি মাথা নাড়ছে।

মেঘে ঢাকা আকাশ। আজ আর জ্যোৎস্না নেই। উঠোনের মুখগুলি ভাল দেখা যায় না। কেমন আবছা অস্পষ্ট। যেন এই সময়ের মুখটা দেখতে পুলকের ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

খুব বেশি সময় দাঁড়ায়নি সে যদিও। ঘরের পিছনে একটু দাঁড়িয়ে থেকে কথাগুলি শুনেই পুকুরপাড়ের হরিতকী গাছটার নীচে চলে এসেছে।

একা একা তার খুব হাসি পাচ্ছিল। ভেড়ার দল কাপুরুষের দল। দরকার কিছু ইয়াংম্যানের সাহসী যুবকের। যারা বুকের রক্ত দেবে, বিপ্লব করবে।

পিনাকী বুকের রক্ত দেয়নি? পিনাকী কি ভীরু ছিল। হরিহর তো একবারও সে কথা বলছে না। আমার ছেলে কিছু করতে চেয়েছিল গুপ্ত মশাই, আমার তাজা ছেলে কিছু একটা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে, বুঝেছেন উমার মা, আমার ছেলে—

উঁহু একথা কি পুলকের বাবা বলতে পারে। তাঁর চোখে পিনাকী যে নষ্ট ছেলে, বখে যাওয়া ছেলে, কুপুত্র।

কাজেই বাবাকে মুখ বুঁজে থাকতে হবে। পাছে তার আর একটি ছেলে নষ্ট হয়ে যায়। তাই তো, যদি পুলক রাজনীতি করতে দলে ভিড়ে পড়ে? কিন্তু পুলক যে পিনাকী নয়।

সব ছেলে কিছু পিনাকী হতে পারে না, সব ছেলে গুলির সামনে বুক পেতে দিতে পারে না হরিহরকে একথা বোঝাবে কে? হরিহরের কেবল ভয় পুলক হারিয়ে যাবে। পুলককে আগলে রাখতে হবে, পুলককে ইস্কুলে যেতে দেব না, সেখানে কত রকমের ছেলে।

কুলদা গুপ্ত মশাইয়ের একটি ছেলে থাকলেও এমন মুখ বুঁজে থাকত না। তখন কি গলা ফাটিয়ে এমন বিপ্লব বিপ্লব করত? কি জানি যদি ছেলের চোখে বিপ্লবের নেশা লাগে। উমার মা?

উমার মার অবশ্য উমাকে নিয়ে অন্য ভাবনা অন্যরকম ভয়। পিনাকীর নষ্ট হয়ে যাওয়া বা পুলকের নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটা এ ব্যাপারে মিলছে না। উমার মার ভয়, পুলকের সঙ্গে কথা বললে কি একটু মেশামেশি করলেই মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে।

হায়রে মানুষের মন। সব মানুষের দুটো করে মন থাকে।

পুলক তার সতেরো বছরের জীবনে বুঝে গেছে, প্রত্যেক মানুষ দুটো চেহারা নিয়ে সংসারে বেঁচে আছে। আজ আবার নতুন করে জিনিসটা বুঝল সে। নতুন করে কুলদা গুপ্তকে দেখল, উমার মাকে দেখল, তার বাবাকে দেখল। মুখে বড় বড় কথা। বিপ্লব চাই রক্ত চাই। কুলদা গুপ্তর ছেলে থাকলে কি এমন গলা ফাটিয়ে কুলদা গুপ্ত কখনও বক্তৃতা করতে পারত?

জলের কাছে জোনাকির ঝাঁক ঘুরে ঘুরে নাচছে। অল্প বাতাসে হরিতকী গাছের পাতা সব সর শব্দ করছে। মেঘটা আস্তে আস্তে কেটে গেছে। চাঁদটাকে আর দেখতে পেল না পুলক। চাঁদ ডুবে গেছে। রাত হয়েছে তবে।

এখন কি সে ঘরে ফিরবে।

পুলক ঠিক করতে পারছিল না।

হয়তো ঘরে গিয়ে দেখবে হরিহর দাওয়ায় বসে বিড়ি খাচ্ছে, সুধারাণী তাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।

দুজনের গল্প শুনে শুনে পুলকের অরুচি ধরে গেছে।

যে জন্য তার ইচ্ছে করছে এবাড়ি ছেড়ে সে কোথাও পালিয়ে যায়। অনেক দূরে চলে যায়। উঁহু, কলকাতা না, কলকাতার চেহারা মনে হ'লে তার মাথা ঝিমঝিম করে। একটা নতুন জায়গায় চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার। সেখানে তার বাবা নেই সুধারাণী নেই কুলদা গুপ্তর মতন মানুষ নেই।

কিন্তু, পুলকের হঠাৎ এখন মনে হল, তার বাবার ঠিক দুটো চেহারা নয়, তিনটে চেহারা। আর একটা চেহারা নিয়ে বুড়ো এমন এক ভান করছে যেন এবেলা ভাত খেলে ও বেলায় তাদের ভাত জুটবে কিনা সন্দেহ, খরচে কুলোতে পারছে না, আগুন হয়ে গেছে চারিদিকের বাজার, তাই না উমার মা ধরে নিয়েছে খরচের ভয়ে হরিহর ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করাচ্ছে না।

মানকচু ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে ছুপুরে মেয়েকে তাই বলছিল না সুধারাণী। দৃশ্যটা এখন আবার মনে পড়ছে পুলকের।

তার ঠোঁট ফেটে কান্না এল।

কিন্তু কাঁদতে পারল কি। তার আগেই সে চমকে উঠল। পায়ের শব্দ হচ্ছে পিছনে।

তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফেরাল পুলক। আবছা ছুটো মূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা কারা? এখানে পুকুর পাড়ে হঠাৎ।

এই ঝোপঝাড়ের নিরালায় কত সময় তো একলা চুপচাপ বসে থাকে সে। কোনোদিন কাউকে তার কাছে আসতে দেখল না।

মূর্তি ছুটো আর একটু সরে আসতে পুলক দেখল ছুটো ছেলে। একটার বয়স বেশি। পুলকের চেয়ে বড় হবে। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা। আর একটা ছেলে ঠিক যেন পুলকের বয়সী। বেশ রোগা মতন দেখতে।

—এই ছোঁড়া, তোর কাছে দেশলাই আছে। বড় ছেলেটা পুলকের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—না। পুলক মাথা নাড়ল।

—কেন তুই বিড়ি সিগারেট খাস না? ছোট ছেলেটাও পুলকের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল।

—না। পুলক আবার মাথা নাড়ল

—বিড়ি সিগারেট খাস না তো একলা জঙ্গলের মধ্যে বসে আছিস কেন। বড় ছেলেটা কেমন যেন নাকে হাসল।

—তুই থাকিস কোথায়।

—ঐ বাড়ি। পুলক আঙুল দিয়ে অশ্বিনী ভদ্রের টালির বাড়িটা দেখাল।

—তাই বল। ছোট ছেলেটা থুতনি নাড়ল। উমাদের ভাড়াটে, তাই না?

—হুঁ।

—কেমন উমার সঙ্গে তোর খাতির টাতির হয়েছে ? বড় ছেলেটা দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

অদ্ভুত প্রশ্ন। ফ্যালফ্যাল করে পুলক মূর্তি দুটোকে দেখতে লাগল। চমৎকার সেন্টের গন্ধ তাদের গা থেকে উঠে আসছে। দুজনের পরণে সার্ট ট্রাউজারস। দিনের আলো থাকলে বোঝা যেত বেশ ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক তাদের। পুলকের মতন ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় না। পায়ে চকচকে বেন্টের জুতো।

—কি হল, চুপ করে আছিস কেন। ছোট ছেলেটা মাথা ঝাঁকাল।

—তোরা কতদিন ওবাড়ি আছিস ? বড় ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল।

—এক বছর। পুলকের খুব রাগ পাচ্ছিল। কিন্তু একা সে। তারা দুজন। ঝগড়া করতে গেলে গায়ের জোরে পারবে না। কাজেই ঢোক গিলে ঘাড় নীচু করে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে লাগল।

—এদিকে তাকা। বড় ছেলেটা দাঁত খিঁচোল। খুব একেবারে ভেজা বেড়ালটি সেজে চুপ করে আছিস ?

—হুঁ, ভেজা বেড়াল। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে শেখোনি। ছোট ছেলেটা ফিক্ করে হাসল। উমার সঙ্গে তোর কেমন খাতির টাতির বলছিস না কেন।

—তোরা আগে কোথায় ছিলি ? বড় ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

—কোলকাতায়। পুলক সংক্ষেপে বলল।

—হুঁ, হুঁ, কলকাত্তাই মাল তুমি—ছোট ছেলেটা ঘাড় বেঁকিয়ে হাতনেড়ে একটা খারাপ ইঙ্গিত করল। ডুব দিয়ে জল খাবার জুড়ি নেই তোমাদের কলকাতার ছোঁড়াদের—আমরা অনেক দেখেছি।

—বল্ না, যে কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার উত্তর দে। বড় ছেলেটা থপ্ করে একেব্যারে পুলকের গা ঘেঁসে বসে পড়ল। এবার

পুলক ভয় পেল।  বড় ছেলেটা বসল তার এ-পাশে, তার দেখাদেখি ছোট ছেলেটা বসল ওপাশে, ঠিক তার গা ঘেঁসে।

—বাবা, এক উঠোনে ঘুর ঘুর কচ্ছ তোমার ছুটিতে, এক চালের তলায় বাস—তার ওপর এমন ডব্‌কা হয়েছে ছুঁড়ি—রাত দিন তুমি ওর দিকে ঘুরে ঘুরে এ বললেই কি আমরা বিশ্বাস করি। আমরা কি কচি ছেলে!

কথাটা বলল ছোট ছেলেটা। এমন ভঙ্গি করে বলল, গাট্টাগোট্টা চেহারার বড় ছেলেটা ফ্যা ফ্যা করে হাসল।

অন্ধকার। তা না হলে দেখা যেত পুলকের ফর্সা মুখটা কেমন লাল হয়ে উঠেছে।

খুব অস্বস্তি বোধ করছিল সে। তার ইচ্ছে করছিল ছোট ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নখের খোঁচা দিয়ে তার চোখ দুটো গেলে দেয়, মুখের চামড়া আঁচড়ে ফালা ফালা করে। কিন্তু সঙ্গে জোয়ান ছেলেটা রয়েছে।

পুলকের কান্না পাচ্ছিল। এবার বড় ছেলেটা তার পিঠে হাত রেখেছে।

—নে, সিগারেট খা, দেশলায়ের দরকার নেই। আমার কাছে লাইটার আছে। দেশলাই চেয়েছিলাম মানে তোর সঙ্গে একটু আলাপ টালাপ করতে চেয়েছি। আ... কি আমরা বুঝতে পারিস না। নে, সিগারেট নে।

—আমি সিগারেট খাই না! পুলক প্রায় উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

—উহুঁ, এখুনি উঠবি কিরে বোস। বড় ছেলেটা পুলকের কাঁধে চাপ দিল। তোকে দিয়ে আমাদের একটু দরকার আছে। খা, সিগারেট খা।

—আমি সিগারেট খাই না। পুলক আবার বলল।

—ধোয়া তুলসীপাতা উনি। ছোট ছেলেটা অন্ধকারে মুখ ভেংচাল বুঝলি অবনী, উনি সিগারেট খান না, লুকিয়ে লুকিয়ে উমিকে চুমু খান।

অবনী বয়সে বড় ছেলেটা খুক্ করে হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

—কি রে, কি বলছে সুদাম তোকে। সিগারেটের টান দিয়ে বড় ছেলেটা আবার পুলকের পিঠে একটা হাত রাখল। অশ্বিনী ভদ্রের ডবকা মেয়েটাকে লুকিয়ে খুব বুঝি চুমুটুমু খাস?

—মিছে কথা। পুলকের আর সহ্য হচ্ছিল না। কেমন যেন গরম হয়ে উত্তর করল।

—এই ছালা, চোখ গরম করবিনি। ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব। সুদাম অর্থাৎ ছোট ছেলেটা রীতিমত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—যাক গে যাক গে। এখনি এত চটাচটি করার দরকার নেই সুদাম। তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস দিকিনি। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি। অবনী অর্থাৎ বড় ছেলেটা পুলকের মুখের কাছে মুখটা সরিয়ে আনল। তারপর চাপা গলায় বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, সিগারেট না খাস না খাবি, হুঁ, তবে কিনা উমার সঙ্গে যে তোর ভাব আছে এটা কিন্তু ভাই আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না।

—উমা খুব ভাল মেয়ে। পুলক অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে জবাব দিল।

—ভাল মেয়ে। সুদাম অর্থাৎ ছোট ছেলেটা আবার ধপ্ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ে দাঁত ছড়িয়ে হাসল। একেবারে যাকে বলে একাদশী ঠাকরুণ ঐ উমারাণী। হি-হি।

—এই সুদাম, থামতো, আমি এর সঙ্গে কথা বলছি। হুঁ, কি বলছিস ভাই, ভাল মেয়ে উমা। খুব ভাল মেয়ে, তাই না। বড় ছেলেটা পুলকের কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে পুলকের হাঁটুর ওপর হাতটা রাখল।

পুলক এবার কথা বলল না।

—না ভাই ঠিকই বলেছিস, একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ল অবনী—তোদের বাড়ির উমা আমাদের দিকে মোটেও তাকায় না। যখন ইস্কুলে যায় আমরা ওদিকের বটগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। রোজ

ভাবি উমা আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবে টাসবে। আমরা কত আশায় থাকি। উঁহু কী অহংকার না ছুঁড়ির। ঘাড়টা সোজা রেখে গটগট করে হেঁটে চলে যায়। ইস্কুল থেকে যখন বাড়ি ফেরে তখনো একই অবস্থা। ভুল করেও একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকায় না, আমাদের মনে যে কী দুঃখ না রে ভাই!

পুলক চুপ করে থেকে বার বার দুটো ঢোক গিলল। উমার কথাটা তা হলে সত্য। স্কুলে যাবার পথে কি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় এসব ছেলেই তাকে উৎপাত করে।

হুঁ, ভাল কথা হাতের সিগারেটটা বড় করে একটা টান দিয়ে অবনী সেটা তার সঙ্গী সুদামেব হাতে তুলে দিল তারপর পুলকের দিকে ভাল করে ঘুরে বসল। হুঁ, শোন ভাই, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমাদের হয়ে।

—কি করতে হবে? পুলক আস্তে বলল।

—একদিন উমাকে নিয়ে তুমি বাড়ি থেকে বেরোবে, যেন তাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছ।

—তারপর?

—ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিয়ে ওদিকে ওই বট গাছটার বাঁ দিকের রাস্তায় চলে যাবে।

—তারপর?

—বললাম তো, বটগাছের ডাইনে উমার ইস্কুলের পথ, কিন্তু তুমি তাকে বাঁদিকের রাস্তাটায় নিয়ে আসবে।

—আমার কথায় ওদিকে ও যাবে কেন! পুলক ভুরু কুঁচকাল।

—এই সোনাচ্চাঁদ যেমনটি বলছি করতে হবে। অবনী না সুদাম নামের ছেলেটা গজগজ করে উঠল।

ধমক খেয়ে পুলক চুপ করে রইল।

—কি হল, পারবি না, যেমন বলছি? অবনী ফিক করে হাসল। আবার পুলকের হাঁটুর ওপর সে একটা হাত রাখল।

পুলক মাথা নাড়ল।

—আমার সঙ্গে উমা ইস্কুলে যাবে না।

—কেন?

—ওর মা আমাকে পছন্দ করে না।

—এই ছোঁড়া, চালাকী করবিনি বলছি। ওপাস থেকে সুদাম আর একটা ধমক লাগাল।—কালও দেখেছি এই পুকুর পাড়ে বসে ছুঁড়ির সঙ্গে ফুর্তিটুর্তি হচ্ছিল, দুজনে মিলে পাখি দেখা হচ্ছিল।

—আহা সুদাম, তুই চুপ কর না। আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। ওদিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে অবনী তখনি আবার পুলকের দিকে ঘাড় ফেরাল।

—হ্যাঁ ভাই, ওর মা যদি তোর সঙ্গে একত্তর বাড়ি থেকে বেরোনো পছন্দ না করে না করল। তুই আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবি। তারপর রাস্তায় উমার সঙ্গে একত্তর হবি। উমার মা কিছু রাস্তায় বেরিয়ে তোদের দুজনকে দেখতে আসছে না।

—আমি পারব না। মিনমিনে গলায় পুলক বলল।

—পারবি না মানে? পারতে হবে তোকে। এবার অবনী উগ্র মূর্তি ধরল।

—এই বান্‌চোৎ, যা বলব, যেমনটি বলব তোকে করতে হবে। ওপাস থেকে সুদাম দাঁত খিঁচোল। আমরা দুজন বটগাছের পেছনে কচু ঝোপটার কাছে থাকব, ভুলিয়ে ভালিয়ে উমাকে নিয়ে তোকে সেখানে চলে যেতে হবে।

—এই ছাখ্, এই ছাখ্। আবছা অন্ধকার। ভাল কিছু দেখা যায় না। তা হলেও সার্টের নিচে হাত ঢুকিয়ে কোমর থেকে অবনী এমন একটা জিনিস বের করল, অবশ্যই তারার আলোয় সেটা রীতিমত চকচক করে উঠল। পুলকের চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

—বুঝলি ছোরাটা সার্টের তলায় নিয়ে তখনি আবার কোমরে গুঁজল অবনী। যদি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতন চলিস তবে কোনদিনই

তোর কোনো বিপদ হবে না। হেসে খেলে রাজার হালে এই নিউ ব্যারাকপুরে থাকতে পারবি। আর যদি আমাদের কথাটতা না শুনিস, নিজের মর্জি মতন চলিস, তা হলে বুঝতেই পারছিস।

অবনীর বাকি কথাটা সুদাম শেষ করল: ধড়টা এক জায়গায় পড়ে থাকবে মুণ্ডটা আর এক জায়গায়, ওই বটগাছের পেছনে কচু ঝোপটার কাছেই তোকে একদিন শেষ করব।

—থাক আর বেশি বলতে হবে না। অবনী অর্থাৎ বড় ছেলেটা ঝপ করে উঠে দাঁড়াল। চ সুদাম।

সুদাম নামে ছোট ছেলেটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

—মনে থাকে যেন, কাল বেলা দশটার সময়, উমাকে নিয়ে তুই দাশ পাড়ার পুরোনো বটগাছটার পেছনে কচু ঝোপের কাছে চলে যাবি। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

ঝিঁঝি ডাকছিল। জোনাকির ঝাঁক পুকুর পাড়ের ঝোপঝাড়ের কাছে নেচে নেচে ঘুরছিল। পাথরের মতন স্থির হয়ে বসে থাকে পুলক। তার গলার ভিতরটা কেমন নোনতা নোনতা ঠেকছিল। হঠাৎ বাতাসটা বন্ধ হয়ে গেছে।

পুলক ঠিক বুঝতে পারছিল না এই অবস্থায় সে কী করবে। এখানে তার জানাশোনা একটিও বন্ধু নেই। কলকাতা হলে কথা ছিল। সেখানে যা হোক অন্ততঃ দু' চারজনের সঙ্গে তার খুবই ভাব ছিল।

এদিকে অবশ্য বাবার জন্য সে তেমন করে কারো সঙ্গে মেলা মেশা করতে পারত না। তাদের নিয়ে সে একটা চমৎকার দল তৈরী করতে পারত। হুঁ, দরকার হলে ছোরা টোরাও জোগাড় করত তারা, হয়তো দু চারটে পটকা টটকাও।

কিন্তু এখানে যে সে একেবারে অসহায়। তার মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম্ করছিল। এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে সে পড়বে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।

কাকে একথা বলা যায়? বাবাকে। ধেৎ। পাল্টা তাকে গালাগাল শুনতে হবে। দিন নেই রাত নেই বাইরে বাইরে ঘুরিস—কাজেই যত আজেবাজে ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়। আর আজেবাজে ব্যাপারে তোকে তারা টানছে। খবরদার কাল থেকে এক পা বাড়ির বাইরে যেতে পারবি না। ঘরে বসে থাকবি। পুরোনো বইটইগুলো নাড়াচাড়া করবি।

তবে কি উমার মাকে কথাটা বলবে পুলক।

না, তা-ই বা বলতে যাবে কেন সে। অন্যরকম অর্থ ধরবে মহিলা। তুমি তো বাপু ইস্কুলে-টিস্কুলে পড়া না, সারাদিন বনবাদাড়ে ঘুরছ, আর যত রাজ্যের গুণ্ডা বদমাস ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়। ওদের সঙ্গে নিশ্চয় তোমার যোগাযোগ আছে। তা না হলে এমন কথা ওরা তোমায় বলতে সাহস পাবে কেন।

কাজেই, পুলক চিন্তা করল, উমার মাকেও এসব বলে লাভ হবে না। উমাকেও না। উমা বলবে, ইস্কুলে যাবার সময় ওরা পেছনে লাগে ঠিকই, গলা খাঁকার দেয় শিষ দেয় দুটো একটা খারাপ কথাও বলে, তা বলে আজ হুট করে ওরা তোমার কাছে এমন একটা প্রস্তাব তুলবে—আমার তো মোটেই বিশ্বাস হয় না। আমাদের নিউ ব্যারাকপুরে এত সাহস নেই কোনো ছেলের।

—এই যে খোকা শোনো!

বাড়ির কাছাকাছি একটা শ্যাওড়া ঝোপের পাশে, জায়গাটা বেশ অন্ধকার, দুটো মানুষ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেয়ে পুলক থমকে দাঁড়াল।

যেন লোক দুটো তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

—এই যে খোকা! একজন হাত তুলে পুলককে ডাকল। পুলক এক পা দুপা করে কাছে সরে গেল।

—তোমার নাম কি ভাই? আবছা অন্ধকার হলেও পুলক বুঝতে পারল দুটো মানুষই বেশ বয়স্ক। যেন ত্রিশ চল্লিশের কাছকাছি

হবে বয়স। একজনের গায়ে সার্ট ধুতি আর একজনের গায়ে গেঞ্জি আর লুঙ্গি।

—তোমার নাম কি ভাই বলো? সার্ট পরা লোকটা চাপা গলায় প্রশ্ন করল।

—পুলক। পুলক আস্তে উত্তর করল।

—বেশ বেশ। লোকটা পুলকের কাঁধে হাত রাখল। তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, তুমি আমাদের একটু সাহায্য করবে ভাই।

—কি করব। বলুন? পুলক খুবই অবাক হয়, রাত হয়ে গেছে, কোনোদিন মানুষ দুটিকে সে দেখেওনি। হঠাৎ এখানে দাঁড়িয়ে তাকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে বলছে?

—তুমি কি ইস্কুলে পড়? গেঞ্জি লুঙ্গি পরা যে মানুষটা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, এবার সে প্রশ্ন করল।

পুলক মাথা নাড়ল।

—তবে খুব ভালই হয়েছে। লুঙ্গি পরা লোকটা বিড়ি টানছিল। বিড়িটা শেষ করে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাপাগলায় হেসে বলল, ইস্কুলে পড়ুয়া ছেলে-গুলোকে আমরা মোটেই পছন্দ করি না, বুঝলে ভাই ওরা কেবল বড় বড় কথা বলে, কাজের কাজ কিছুই হয়না ওদের দিয়ে কি বলো হে?

—সত্যি কথা, ধুতি পরা লোকটা মাথা ঝাঁকাল। কেবল মুখের লম্বা লম্বা কথা—এক ফোঁটা কাজ হয় না কোনো চাঁদকে দিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলে নেতাজীর কথা বলে রাসবিহারী বোসের কথা বলে, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

হি হি, এবার লুঙ্গি পরা লোকটা চাপা গলায় হাসল। শুনলে হে ছেলে, আমার বন্ধু কী বলছে? ইস্কুলে পড়ুয়া ছোঁড়ারা কেবল পরীক্ষার সময় বই নিয়ে ঢুকতে জানে আর পরীক্ষায় ফেল করলে মাস্টারদেব মাথা ভাঙতে জানে।

—আর ইস্কুলের টেবিল চেয়ার ভাঙতে জানে, লাইবেরী ঘরে.

আগুন দিতে জানে। সার্ট পরা মানুষটাও তার সঙ্গীর মতন চাপা গলায় হাসল। তারপর পুলকের দিকে চোখ রেখে বলল, তুমি কি কোনোদিন ইস্কুলে পড়েছিলে ভাই ?

—হুঁ, পুলক বলল, কলকাতা ইস্কুলে।

—বাঃ বাঃ, তবে তো তুমি অনেক কিছু দেখেছ, অনেক কিছু শুনেছ। তোমাদের ইস্কুলে কি এসব ব্যাপার হয়েছিল ?

—একবার হয়েছিল। পুলক বলল।

—তুমি কি দলে ছিলে ?

—না।

—কেন ?

—আমার জ্বর হয়েছিল, যেদিন ছেলেরা টেবিল চেয়ার ভাঙছিল, লাইব্রেরী ঘরে আগুন দিচ্ছিল সেদিন আমি স্কুলেই যাইনি।

—যাক গে বাবা, তবু যে তুমি সেসব মাথাভাঙা ছেলেদের দলে ছিলে না।

পুলকের মনে পড়ল, সেদিন তার দাদা পিনাকী ছেলেদের লীডার হয়ে তাদের দিয়ে এসব কাজ করিয়েছিল। তারপর থেকেই পিনাকীর স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, পিনাকীর সঙ্গে আরও বেশ কিছু ছেলের নাম কাটা যায়। তারা আর কোনোদিনই স্কুলে ঢুকতে পারেনি।

—যাক গে এখন কাজের কথায় আসছি, হ্যাঁ ভাই, তুমি কিন্তু আমাদের একটু সাহায্য করবে। সার্ট পরা লোকটা পুলকের একটা হাত ঝাঁকুনি দিল।

—কি কাজ বলুন না।

—ইস্কুলের চেয়ার বেঞ্চি ভাঙা কি লাইব্রেরী ঘর পোড়ান কি মাস্টার মশায়ের মাথায় বাড়ি দেওয়াকে আমরা কাজ বলি না, তোমাকে দিয়ে একটা সত্যিকার ভাল কাজ আমরা করতে চাই। মানে আমরাও করব। আমাদের সঙ্গে থেকে তুমিও করবে।

—এটাই হল আসল কাজ, মানে যা দিয়ে দেশের উপকার হবে, বুঝলে ছোকরা। লুঙ্গি পরা লোকটা দুবার মাথা ঝাঁকাল।

—কি হল পারবে? সার্ট পরা লোকটা আবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পুলকের হাতটা ছেড়ে দিল।

—বলুন। পুলক মিনমিনে গলায় উত্তর করল।

—তোমাকে এই থলেটা রাখতে হবে। এতক্ষণ পুলক লক্ষ্য করেনি। সার্ট পরা লোকটা ঝোপের কাছ থেকে একটা ছোট মতন চটের থলে তুলে নিয়ে পুলকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

—এটার মধ্যে কী আছে। পুলক একটু ঘাবড়ে গেল। হাত বাড়িয়ে থলেটা ধরতে গিয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল।

—এটার মধ্যে তিনটে পটকা আছে।

—বোমা! পুলক চমকে উঠল।

—হ্যাঁ, রে ভাই হ্যাঁ, এত ভয় পাবার কিছু নেই। খুব একটা সাংঘাতিক জাতের বোমা কি আমরা তৈরী করতে পারি, এই কোনোরকমে কাজ চালানর মতন জিনিস আর কি। তেমন মালমশলা কি আর সহজে জোগাড় করা যায়।

—এগুলো রেখে আমি কী করব। পুলক পর পর দুটো ঢোক গিলল।

—বলছি। লুঙ্গি পরা লোকটা এদিক ওদিক তাকাল তারপর ফিসফিসে গলায় বলল, তোমাদের পাড়ার পরেশ মুদীর দোকান আমরা লুট করব।

—কেন। পুলক ভীষণ চমকে উঠল।

—কেন বুঝতে পারছ না ছেলে। সার্ট পরা লোকটা গলার নিচে হাসল। তেলের দর ডালের দর মশলার দর বেটা কেমন চড়িয়ে দিচ্ছে দিন দিন—তুমি কি এটা ওটা কিনতে পরেশের দোকানে যাও না। তুমি কি খোঁজখবর রাখ না।

—হুঁ, যাই। একটু ভেবে নিয়ে পুলক বলল, তা সব মুদীই তো জিনিসের দর বাড়িয়েছে শুনছি।

—ঐ সব বেটা মুদীকেই আমরা টিট করব, মুদি মজুতদার আড়তদার কাউকে বাদ দেব না।

পুলক চুপ করে রইল।

—যাক্ গে, এখন শোনো। তুমি এই থলেটা আজ তোমার ঘরে নিয়ে রেখে দাও, সাবধানে রাখবে, কাল ঠিক এমন সময় তুমি এটা নিয়ে আবার এখানে এসে দাঁড়াবে! আমরা তিনজনে একসঙ্গে গিয়ে পরেশের দোকানে চড়াও হব।

—না না, আমি পারব না, আমি কোনোদিন রাজনীতি করি না। আমার এসব ভয় করে। পুলক অনুনয়ের গলায় বলল। ভয়ে সে একটু একটু কাঁপছিল।

—কী বোকা ছেলে রে বাবা! লুঙ্গি পরা লোকটা বলল, এটাকে রাজনীতি বলে নাকি। আমরা মিটিং করছি না পার্টি গড়ছি না, কোনোরকম আওয়াজও তুলছি না। মুজতদার আড়তদারদের বাড় বেড়ে গেছে, তাদের একটু শিক্ষা দিতে চাইছি। কেবল পরেশ মুদীও একটি ছোট খাটো মজুতদার আমরা খোঁজ পেয়েছি তার গুদোমে দেড় শ টিন্ সরষের তেল লুকোনো আছে, সব টেনে বের করে গাঁয়ের মানুষকে বিলিয়ে দেব। বুঝলি ?

—তা হলে বোমা কেন ? বোমা নিয়ে কি হবে। পুলক আমতা আমতা করে বলল।

এই ত্মাখো, এখনো যেন মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে, গোঁফ গজাবার বয়স হল। সার্ট পরা লোকটা ভেংচি কাটার মতন চাপা গলায় হাসল। দু একটা পটকা না ছুঁড়লে পরেশ তার গুদোমের চাবি আমাদের হাতে তুলে দেবে কেন। তাকে ভয় পাওয়াতে হবে না।

পুলক চুপ।

—নে, লুঙ্গি পরা লোকটা এবার রুক্ষ গলায় বলল এখন থলেটা

তুই বাড়ি নিয়ে যা, এটা নিয়ে চলাফেরা করায় আমাদের অসুবিধে আছে, আমরা অন্য পাড়ায় থাকি, এই জন্যই তোর কাছে আজ এটা রাখতে দেওয়া—কাল আবাব এখানে তোদের পাড়ায় আমাদেব আসতে হচ্ছে, কাজেই জিনিসটা হাতের কাছে পেতে সুবিধে হবে বলে তোর কাছে রাখছি।

—থলেটা আমি এখন বাড়ি নিয়ে গেলে আমার বাবা সন্দেহ করবে। ভেতরে কি আছে দেখতে চাইবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর বাবাকে আমবা খুব চিনি। নাম হবিহব দত্ত। অশ্বিনী ভদ্রেব ভাড়াটে তোবা তুই আমাদেব চিনিস না। তোকে আমরা চিনি। সারাদিন বনবাদাড়ে পাখি দেখে বেড়াস। আমরা কি খোঁজখবর রাখি না ভাবিস, তুই কারো সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করিস না। ইস্কুলে যাস না। এই জন্যই তোকে আমাদেব পছন্দ হয়েছে। তোকে বিশ্বাস করা যায়। নে ধর।

—আমার ভয় করছে। পুলক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এটা এখন বাড়িতে নিয়ে গেলেই বাবা সন্দেহ করবে।

—এখনই এটা তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না। সার্ট পরা লোকটা বলল, আমবা জানি তুই অশ্বিনী ভদ্রের ছোট ঘরটায় থাকিস, এখন ধারে কাছে ঝোপঝাড়েব মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রাখ এটা। তারপর তোর বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়বে, বাড়িব অন্য লোকজনও যখন আর জেগে থাকবে না, তখন তুই তোব ছোট ঘরটায় গিয়ে চুপি চুপি এটা রেখে দিবি। ব্যস, কেউ টের পাবে না। নে ধর সার্ট পরা লোকটা আবার পুলকেব দিকে থলেটা বাড়িয়ে দিল।

পুলক একভাবে হাতটা গুটিয়ে রাখে।

—এই ছাখ। লুঙ্গি পরা লোকটা এবার চোখ পাকাল যেমনটি বলছি তোকে করতে হবে। আমার হাতে এটা কী দেখছিস। বলে সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে যে জিনিসটা বার করল দেখে পলকের

গলা শুকিয়ে গেল। অতবড় একটা ছোরা। আবছা অন্ধকারেও চকচক করছে।

—নে ধর।

এবার পুলক হাত বাড়িয়ে থলেটা ধরল।

—আর খবরদার, লুঙ্গি পরা লোকটা আবার বলল, যা যা বললাম কাক প্রাণিটিও যাতে জানতে না পারে হুঁ, যদি টের পাই. কাউকে কি বলেছিস, তা হলে বুঝতে পারিস খুব বেশিদিন আর বনবাদাড়ে ঘুরে তোকে পাখি দেখতে হবে না। ঐ বনের মধ্যেই ধড়টা একজায়গায় মুণ্ডটা এক জায়গায় পড়ে থাকবে।

—না না, কাউকে বলবে না, পুলক ভাল ছেলে। সার্ট পরা মানুষটা পুলকের পিঠে হাত রেখে ছোট একটা চাপড় দিল। বিশ্বাসী ছেলে। ইস্কুলের মাথাভাঙ্গা ছেলেগুলি হলে তবু একটা কথা ছিল। হ্যাঁ ভাই পুলক ঠিক কি না।

থলেটা হাতে নিয়ে পুলক ঘাড় গুঁজে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আমরা কাল এমন সময় আসব, আর একটু আগে, এখন রাত নটা বাজে ঠিক সাড়ে আটটায় কাল এখানে এসে যাব। লুঙ্গি পরা লোকটা অন্ধকারেই হাতের ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, পরেশ যখন ক্যাশটেশ গুটিয়ে নিয়ে দোকান বন্ধ করতে যাবে ঠিক তখন গিয়ে তার দোকানে চড়াও হব।

—ঠিক আছে ; এই বেলা আমরা চলি ভাই। পুলকের পিঠে আর একটা চাপড় দিয়ে সার্ট পরা লোকটা লুঙ্গি পরা লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। চলো হে।

দুজন আস্তে আস্তে আশস্যাওড়ার ঝোপটা পার হয়ে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পুলক হতভম্বের মতন একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এক সময় তার হুঁস হল তিনটে তরতাজা বোমা হাতে ঝুলিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাদা পিনাকীর হাতে একদিন এমন বোমা ছিল।

॥ ৬ ॥

সারারাত পুলক ছটফট করেছে। তার চোখে এক ফোঁটা ঘুম ছিল না।

কেরাসিন কাঠের বাক্সটা, যেটা উমার মা তাকে পড়ার টেবিল করতে দিয়েছে, অনিদ্রার চোখ নিয়ে কবারই সে দেখছিল। কেন না ওটার মধ্যে থলেটা লুকিয়ে রেখেছে সে। হুঁ, তিনটে তাজা বোমা। যদি এক আধটা বোমা ফেটে যায়, শোনা গেছে ঘরে থাকতে থাকতেও আপনা থেকে এসব জিনিস ভীষণ শব্দ করে ফেটে যায়, ঘরের চাল উড়িয়ে দেয়, দেওয়াল টেওয়াল ফাটিয়ে দেয় আরও কত কিসব ব্যাপার ঘটায়—ইস্ তাহলে কেমন কেলেঙ্কারী হবে।

পুলকের বাবা, হাউমাউ করে কাঁদবে আর মাথার চুল ছিঁড়বে' ভাববে পুলকও পার্টি করছে, রাজনীতি করছে তা না হলে বোমা পটকা সে পেল কোথায়।

বস্তুত এমন একটা দৃশ্য পুলক কল্পনাই করতে পারছিল না। পিনাকীর শোকে বুড়ো মানুষটা অস্থির, তার ওপর পুলক যদি এমন একটা কাণ্ড করে বসে—হরিহর হয়তো আত্মহত্যাই করে বসবে।

একটু একটু করে রাত ফরসা হচ্ছিল। একটা দুটো পাখি সবে উডতে শুরু করেছে। বোমার ভাবনাটা মাথা থেকে সরে গিয়ে পুকুরপাড়েব অন্ধকারে সন্ধ্যোবেলা দেখা সেই ছেলে দুটোকে ঝপ্ করে মনে পড়ে গেল।

ওরাও ছোরাব ভয় দেখিয়েছে। উমাকে নিয়ে আজ বেলা দশটার সময় খালধারেব বটগাছের ওধারে ঝোপের কাছে তাকে চলে যেতে হবে। তা না হলে তার মুণ্ডটা এক জায়গায় ধড়টা আর এক জায়গায় পড়ে থাকবে।

কলকাতা সহরটা বিষের মতন লাগছিল না! এখন এই নিউ ব্যারাকপুরের ছবিটা তার কাছে কেমন লাগছে?

হাত দুটো আড়াআড়ি করে মাথার নিচে রেখে ঠিক হয়ে শুয়ে পুলক কড়িকাঠ দেখছিল আর লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছিল।

এখানকার ঝকঝকে রোদ চকচকে আকাশ ও মেঘলা দিনের অপরাজিতা ফুলের রঙের গাঢ় নীল মেঘ এবং রঙ-বেরঙের পাখি—সব কেমন স্বপ্নের মতন মিলিয়ে যাচ্ছিল।

টুক্ টুক······

চমকে উঠল পুলক জানালায় কেউ আঙুলের টোকা দিচ্ছে না!

এক সেকেণ্ড স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। রাত্রে জোরে বৃষ্টি নেমেছিল। জলের ছিটে আসছিল বলে জানালাটা বন্ধ রেখেছিল। এখন ভোরের দিকে জলটল থেমে গেছে বোঝা যায়। কিন্তু এত সকালে কে তার জানালায় এসে দাঁড়াবে।

টুক্ টুক্ টুক্ ·····

এবার তিনটে টোকা। তিন সত্যির মতন। টিক্-টিক্ টিক্। টিকটিকি কি তিনবার ডাকে।

ভাল রে ভাল, মানুষটা কে দেখতে হয় তো!

বিছানা থেকে নেমে পুলক হাত বাড়িয়ে ছিটকিনিটা নামিয়ে দিয়ে পাল্লা দুটো খুলে ফেলল।

চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। আবছা অন্ধকারে ভরা বৃষ্টির গন্ধ কুয়াশার গন্ধে মেশান ফুটফুটে মুখ। ভোরের নরম আলোয় আরও মিষ্টি দেখাচ্ছে।

—এত সকালে? ফিসফিস করে উঠল পুলক।

—হুঁ, ফুল তুলছি। চাপা হিসহিসে গলায় উমা উত্তর করল।

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে লতার মতন ছিপছিপে শরীরটাকে জানালার গরাদের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে ঠোঁট টিপে হাসল।—এত সকালে বাবুর ঘুম ভাঙ্গল। অবাক কাণ্ড তো!

খুবই অবাক হচ্ছ, তাই না! চাপা গলায় পুলক বলল।—না-ই বা হব কেন, বেলা নটার আগে যার ঘুম ভাঙ্গে না সেই মানুষ কিনা পাখি ডাকার আগে জেগে বসে আছে আজ।

—হুঁ, তাই বসে আছি। এখনো বাড়ির মানুষগুলির নাক ডাকার শব্দ শুনছি।

—তোমার বাবার নাক ডাকছে, আমার মা সুধারাণীর নাক ডাকছে, কুন্দদা গুপ্ত মহাশয়ের ঘরের দুজনই নাক ডাকাচ্ছে। ওদের কাছে এখনো রাত দুপুর। হি-হি।

—তুমি রোজ ফুল তোল? পুলকের ইচ্ছে করছিল জানালার বাইরে গলাটা বাড়িয়ে দেয়। যেটা অবশ্য সম্ভব নয়। গরাদের সঙ্গে কপালটা ঠেকিয়ে রাখল সে। উমার গরম নিশ্বাস তার ঠোঁটে কপালে লাগছে। ফুলের গন্ধের মতন টাটকা, সুগন্ধী সেই নিশ্বাস। যেন এক এক ঝলক ফুলের গন্ধ এসে নাকে মুখে লাগছিল পুলকের।

—আমি রোজ ফুল তুলি। রোজ একটিবার এসে তোমার জানালার কাছে দাঁড়াই। তুমি কি সে খবর রাখ! তুমি তখন সাত হাত ঘুমের তলায় ডুবে থাক।

—এখন থেকে রোজ ভোর ভোর আমি জেগে থাকব। পুলক বলল!

ঘাড় ঘুরিয়ে উমা আবার এদিক ওদিক তাকাল। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা একটা কাক তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

দোরটা খুলে দাও। এদিকে চোখ রেখে উমা চাপা গলায় বলল, আমি ভেতরে ঢুকব।

—ভেতরে আসবে তুমি! যেন পুলক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—তা না হলে কখন আসব বলো ? উমা ঢোক গিলল। যেমন করে মা আমায় চোখে চোখে রাখছে।

—তা-ও বটে। পুলক বিড়বিড় করে বলল, তোমার মার কেবল ভয় আমার সঙ্গে মিশলে তুমি নষ্ট হয়ে যাবে।

—আহা মার সেসব ভয় আমি বড় একটা গ্রাহ্য করি কি না। খোল, শিগরির দোরটা খুলে দাও। পাঁচ দশ মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলে যাই। কখন আবার কে জেগে ওঠে।

পুলকের হৃৎপিণ্ড দুরদুর করছিল। সে ভাবতেই পারছে না এমন চমৎকার একটা সুযোগ এসে যাবে নিরিবিলি এক জায়গায় বসে দুজনের কথা বলার। যেন রাত্রে ঘুম না হয়ে তার শাপে বর হল।

দোর খুলে দিতে উমা পা টিপে টিপে ওদিক দিয়ে ঘুরে এসে ভিতরে ঢুকল। পুলক তখনি আবার দোরটা ভেজিয়ে খিল এঁটে দিল।

উমা পুলকের হাত ধরল।

পুলক উমার কাঁধ দুটো ধরল। ধরে তখনি আবার দু হাত সরিয়ে নিল।

—কি হল। চাপা গলায় উমা বলল।

—ভীষণ ভয় করছে। পুলক বলল।

—বা রে, আমি যেখানে সাহস করে তোমার ঘরে ঢুকেছি, আর তুমি ঘরে থেকেই এখন ভয়ে মরছ।

পুলক চুপ।

উমাও পুলকের হাতটা ছেড়ে দিল।

—এত ভীতু মানুষকে দিয়ে কিছু হয় না। উমা হতাস গলায় বলল।

—বা রে, লজ্জা পেয়ে পুলক ঠোঁট চিরে হাসল। একটু একটু করে সাহস হবে, চট করে একদিনে কি—

—কাল হয়তো এমন সুযোগ আসবে না, উমা বলল, এসে

দেখব। তুমি ঘুমিয়ে আছ। আমি জানালায় এসে দাঁড়াব। তুমি টেরও পাবে না। আমি ফিরে যাব।

—খুব টের পাব, আমি রাত জেগে বসে থাকব দেখবে জানালার কাছে বসে আছি।

—আমায় নিয়ে কবিতা লিখেছ?

—ভাবছি। পুলক ঘাড়টা নেড়ে বলল, অনেকটা ভাবা হয়ে গেছে। দু এক দিনের মধ্যে লেখা শেষ হয়ে যাবে।

যেন উমা কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না চুপ করে রইল।

—একটু বোসো না আমার বিছানায়। পুলক আবার উমার কাঁধ ধরতে গেল। উমা এবার সরে দাঁড়াল।

—কি হবে তোমার বিছানায় বসে। কথাটা বলেই সে ফিক্ করে হাসল।

পুলক অপ্রস্তুত হল। বাইরে পাখিদের কিচির মিচির ক্রমেই বাড়ছিল। ঘরের ভিতরের জমাট অন্ধকারটা সরে গিয়ে দুধের সরের মতন একটু আলো টলটল করছিল।

—আমার ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা চুমু খাই। যেন অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর পুলক আস্তে বলল।

ইচ্ছে করছে। উমা ঘাড় বেঁকিয়ে আবার কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। একটু চুপ থেকে পরে বলল, তা আমায় নিয়ে কবিতা লিখতেও তো তোমার খুব ইচ্ছে করে। করে না।

—হুঁ, করে বৈকি। বলছি দু এক দিনের মধ্যে সেটা লেখাও হয়ে যাবে। তোমাকে দেখাব।

—আর এখন যে ইচ্ছেটা হল সেটা? তা-কি দু একদিন পরে হবে।

—না তা কেন হবে। এবার পুলক অল্প শব্দ করে হাসল। বলল, ইস্ কী ভীষণ চালাক মেয়ে তুমি! এই কাজটা আমি এখুনি সেরে ফেলতে পারি। বলার সঙ্গে সঙ্গে পুলক গলাটা

বাড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকতে গেল। উমা পাশ কেটে সরে দাঁড়ায়। তারপর জোরে মাথাটা ঝাঁকায়।

—উঁহু তুমি ভীতু, এই মাত্র বলছিলে তোমার ভয় করছে, ভয় নিয়ে কি কোনো মেয়েকে ভাল করে চুমু খাওয়া যায়।

—আমি মোটেই ভীতু নই। এবার গরম গরম শ্বাস পড়ছিল পুলকের। দু হাত বাড়িয়ে আবার সে উমাকে ধরতে গেল। পাশ কাটিয়ে উমা আর একদিকে সরে গেল।

—তুমি কাছে এসে দেখ মোটেই আমার ভয় করবে না—পুলক ডাকল।

উঁহু. দূর থেকে উমা ঘাড় বেঁকাল।—আমায় নিয়ে কবিতা লিখতে তোমার দেরি হচ্ছে, তেমনি আমাকে চুমু খেতেও তোমার দেরি হবে – একদিন দুদিন করে অনেক দিন কেটে যাবে।

—কী মুস্কিল! যেন এবার রেগে গেল পুলক।—কবিতা লেখার চেয়ে চুমু খাওয়া সহজ। তুমি কাছে এসে দেখ।

—কবিতা লেখার চেয়ে চুমু খাওয়া অনেক কঠিন। এবার উমা চাপা গলায় হাসল।

—কঠিন নয় কঠিন নয়। পুলকের হৃৎপিণ্ড দ্রুত ওঠা নামা করছিল। হাত বাড়িয়ে আবার উমাকে ধরতে গেল। যেন উমা একটা প্রজাপতি। ধরা না দিয়ে আর একদিকে সরে গেল।

—তুমি হেঁয়ালীর মতন, পুলক হঠাৎ থমকে গেল। মুখটা কালো করে ফেলল। যেন কাঁদো কাঁদো শোনাল তার গলার স্বর। —তুমি কুয়াশার মতন, চোখে দেখছি, কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে খুঁজে পাচ্ছি না।

—তুমি ভীতু, তাই ধরা দিচ্ছি না। কেমন যেন নিষ্ঠুরের মতন সুধারাণীর মেয়ে হাসল।—তুমি চুমোও খেতে জান না, কবিতাও লিখতে পার না।

—নিশ্চয় পারি, একশবার পারি, কাছে এসে দেখ।

—উহু, তুমি কেবল বনবাদাড়ে ঘুরে পাখি দেখতে জান। আর কিছু পার না।

—আমি অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু পারি। রুদ্ধ-স্বরে পুলক বলল।

—তোমার এক ফোঁটা সাহস নেই, সাহস যদি থাকত……বলতে বলতে উমা থেমে গেল।

যেন কার কাশির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির কেউ কি জেগে গেল!

চমকে উঠে দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকাল। কেমন নিঃসাড় হয়ে রইল তারা। তারপর আর কোনো শব্দ নেই। বাড়ি চুপচাপ। কেবল পাখিরা কিচির মিচির করছিল।

—এসো, লক্ষ্মীটি কাছে এসো। কাতর গলায় হাত বাড়িয়ে পুলক ডাকল।

উমা মাথা নাড়ল।

—আমি কুয়াশা আমি জোছনা, অন্ততঃ তোমার কাছে, যেহেতু তোমার সাহস নেই, যদি তুমি তোমার দাদার মতন সাহসী হতে, এক্ষুণি তোমার বুকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

—দাদার চেয়ে আমার অনেক বেশী সাহস, আমার দাদা পিনাকীর চেয়েও বড় আমার বুকের পাটা।

—ইস্ কতবড় বুক দেখি। বুকটা দেখাও তো। উমা খুক্ করে হাসল।

যেন অপমানের মতন লাগল, ঠাটার মতন শোনাল কথাটা। নিজের গেঞ্জি ঢাকা বুকের দিকে এক পলক চেয়ে থাকল পুলক। তারপর চোখ খুলে উমার চোখের দিকে তাকাল।

—কাল পর্যন্ত আমি ভীতু ছিলাম, বুঝলে মেয়ে, আজ আমার সাহস বেড়ে গেছে। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে আমি এখন।

—তাই নাকি! উমা আর হাসছিল না। না হেসে বলল,

মাকে লুকিয়ে ভোরের অন্ধকারে তোমার ঘরে ঢুকেছি বলে দপ্‌ করে তোমার সাহসের সলতেটা জ্বলে উঠল। তাই না?

মোটেই তা নয়, মোটেই তা নয়। পুলক জোরে মাথা ঝাঁকাল। —আমি কত বড় বীর, কেমন সাহসী ছেলে আজ তার প্রমাণ পাবে।

—কখন? আবার উমার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।

—যখন ইস্কুলে যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। পুলক গম্ভীর হয়ে বলল।

—তারপব। উমা কান পেতে শুনছিল।

—খালধারের পুরোনো বটগাছটার কাছে গিয়ে তুমি ইস্কুলের রাস্তায় না গিয়ে ডাইনে মাটির রাস্তাটা ধরবে।

—তারপর? ওদিকে তো জঙ্গল। উমা আস্তে বলল।

—হুঁ জঙ্গল। একটা ঝোপের কাছে দুটো বদমাস ছেলে দাঁড়িযে থাকবে।

—তারপর? এবার উমার চোখের পলক পড়ল না।

—তোমায় সেখানে দেখে তারা ভীষণ খুশি হবে। ছুটে এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইবে।

—তুমি তখন কী করবে। হাঁদারামের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। এই তো? উমা না বলে পারল না।

—মোটেই তা নয়। ওরা ছুটে আসছি দেখে আমি এমন জিনিস ছুঁড়ে মারব, বদমাস দুটোকে আর এক পা এগোতে হবে না। তাদের মাথাব খুলি উড়ে যাবে, হাত পা উড়ে যাবে, চোখের ওপর একটা ভীষণ কাণ্ড দেখতে পাবে তুমি।

—ওমা, তোমার কথা শুনে এত হাসি পাচ্ছে। উমা বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল।—মনে হয় স্বপ্নের মধ্যে তুমি এসব বলছ।

—হুঁ, স্বপ্নের মধ্যে, আজ যখন তুমি ইস্কুলে যাবে আমি তোমার সঙ্গে থাকব, তখন দেখবে বটগাছের ওধারে ঝোপের কাছে, সত্যি

বলছি কি স্বপ্নের মধ্যে বলছি তুমি তা টের পাবে, ভয়ানক শব্দ করে বোমা ছুটো ফেটে যাবে। তোমার কানে তালা লাগবে।

—ইস, হেসে বাঁচিনে। চাপা গলায় উমা হাসল। যেন কত বোমা টোমা তোমার হাতে এসে গেছে। যেন তোমার দাদা পিনাকীর চেয়েও তুমি সাংঘাতিক কেউ হয়ে গেছ।

—হয়েছি বৈকি। পুলক উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল আর উমার চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি আমায় ভীরু বলছ, সন্ধ্যের পর দেখবে আর এক কাণ্ড। পরেশ মুদীর খুব বাড় হয়েছে তেলের দাম ডালের দাম আকাশে তুলে দিয়েছে বেটা। তাকে আজ বলব গুদোম থেকে ডালের বস্তা তেলের টিন বের করে দাও, গাঁয়ের গরীবদের মধ্যে সব বিলিয়ে দেব।

—তারপর? পরেশ মুদী তোমার কথা শুনবে কেন। উমা আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

—শুনবে, পুলক মাথা ঝাঁকাল। শুনতে হবে, না শুনে তো ও বেটারও হাত উড়ে যাবে পা উড়ে যাবে মাথার খুলি উড়ে যাবে।

—আমার মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে তুমি এসব বলছ। যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ। বুঝলে ছেলে।

—স্বপ্ন নয় সত্যি।

—কটা বোমা তোমার কাছে আছে শুনি।

—তা তোমায় বলব কেন।

—ঐ তো। উমা নতুন করে হাসল। বড় বড় কথা বলে তুমি আমার ভোলাচ্ছ।

—মোটেই তোমাকে ভোলাচ্ছি না। তুমি দেখতে চাও কটা বোমা আমার হাতে আছে। পুলক আবার উত্তেজনায় কাঁপছিল। তার চোখ গোল হয়ে গেল।

—হুঁ, দেখাও, আমার দেখতে ইচ্ছে করছে কত বড় বীর তুমি। উমা হিসহিস করে উঠল।

—এখানে এসো, কাছে এসো। কেরাসিন কাঠের বাক্সটার কাছে পুলক ছুটে গেল। উমা পিছনে। এই ত্যাখো, দেখবে, দেখতে চাও? এসে হাত দুটো বাক্সের ভিতর ঢুকিয়ে দিল পুলক। ত্যাখো তাকিয়ে ভাল করে দেখ বিশ্বাস হয় কিনা।

পুলকের শরীর কাঁপছিল। হাত কাঁপছিল তিনটে বোমা একসঙ্গে বাক্স থেকে সে তুলে এনেছে। উমার চোখ বড় হয়ে ওঠে, শ্বাস ফেলছে না সে। রামধনুর মতন ভুরু দুটো বেঁকে গিয়ে কপালে ঠেকেছে।

—দেখছ, ভাল করে দেখ মেয়ে।

যেন উমাকে ভাল করে দেখাতে গিয়ে কাঁপা হাত দুটো আর একটু উঁচোয় তুলে ধরে পুলক ঝুঁকে পড়ার দরুণ উমার হাতের ধাক্কা লাগল না কি অসতর্ক ভাবে নাড়া-চড়ার ফলে আপনা থেকে পুলকের হাত থেকে একটা তাজা বোমা ছিটকে নিচে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। তারপর আর একটা, তারপর আবার!

পর পর তিনটে শব্দে সেদিন উষাকালে চৌধুরীপাড়ার সব মানুষের ঘুম ভেঙে যায়।

নিউ ব্যারাকপুরের এই তল্লাটের নাম চৌধুরী পাড়া। প্রচণ্ড শব্দে চৌধুরী পাড়ার আকাশ মাটি ঘর বাড়ি গাছপালা কেমন থরথর করে কাঁপছিল। যেন মুহূর্তের মধ্যে সাংঘাতিক একটা ভূমিকম্পের মতন কিছু ঘটে গেল। তারপর দলে দলে মানুষ ছুটে এলো দেখতে।

অশ্বিনী ভদ্রের টালির বাড়ির ছোট ঘরটার চাল উড়ে গেছে, বেড়া ভেঙ্গে গেছে, বেড়ার খানিকটা অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে, একটা বিশ্রী পোড়া গন্ধ ভোরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

থানা থেকে দারোগা বাবু এল। পুলিশ এল। এক সঙ্গে দুটো

লাস সেই পোড়া ঘরটা থেকে টেনে বের করা হোল। দুটোরই মুখ ঝলসে গেছে। মাথার খুলি উড়ে গেছে। • একটির হাত গেছে একটির পা।

•হুঁ, এক সঙ্গে বসে দুটিতে বোমা তৈরি করছিল, ছেলেটা মেয়েটা, লোকে বলাবলি করল। একত্রে বসে তারা কেমন সাংসারিক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আহা কী দিন কাল পড়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে কার ঘরের ছেলে কী করছে, কার মেয়ে কী করছে, বোঝার উপায় আছে কিছু।

এ-পাড়ার ও-পাড়ার এবং আরও দু তিনটা গাঁয়ের মানুষ দেখল উন্মাদিনীর মূর্তি ধরে অশ্বিনী ভদ্রের স্ত্রী সুধারাণী হাউ হাউ করে কাঁদছে, মাথার চুল ছিঁড়ছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সকলকে শুনিয়ে বলছে, কেমন শত্রুকে আমি ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম কেমন হাড় বদমাস ওই বুড়োটা। অ্যাঁ ওর বজ্জাত ছেলে যে পার্টি করত বোমাবাজী করত আমি কি জানতাম, আহা হা হা আমার অমন ফুটফুটে দুধের মেয়েটাকেও হারামজাদা দলে টেনে নিয়েছিল।

একটু দূরে একটা সূর্যমুখী গাছের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে হরিহর দত্ত। ঘাড় গুঁজে পায়ের কাছের ঘাস দেখছিল আর বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিল। কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু কাঁদতে পারছিল না।

তার চোখের সব জল শুকিয়ে গেছে।

---